

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি

রচনা

মুহাম্মদ আবদুল মালেক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
ড. মোহাম্মদ ইউছুক
মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ
ইকবাল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম শরীফ

সম্পাদনা

ডক্টর মো. আখতারুজ্জামান
মুহাম্মদ তমীযুদ্দীন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই , ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
রেবেকা সুলতানা লিপি
মোঃ আনিছুর রহমান

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন
আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
কালার গ্রাফিক

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিজে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। তাই আপোদান ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অল্পনিহিত মেধা ও সজ্জাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার তিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-পোষ ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্থনাদিবোধ জন্মাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, গ্রহণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইচ্ছিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কাজ, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে।

ইসলামের মূল স্তম্ভ ও বিধানসমূহ শাস্ত্র ও অপরিবর্তনীয়। একবিংশ শতকের এই সূচনালগ্নে পরিবর্তিত সময়ের প্রেক্ষাপটে শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তনের পটভূমিতে ইসলামের শাস্ত্র বিধানসমূহকে জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মের মানবতাবাদী জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীরা দেশপ্রেমবোধ, সত্যতা, ন্যায়নিষ্ঠা, সহনশীলতা, উদারতা, শ্রমের মর্যাদা, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও সাম্যের চেতনায় উজ্জীবিত হয় সেই দিক বিবেচনায় রেখে ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই অউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে - যার প্রতিফলন ইতিপূর্বে বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আত্মবিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

সূচিপত্র

অধ্যায়ের নাম	পার্ঠের নাম	পৃষ্ঠা নম্বর
প্রথম অধ্যায় আকাইদ (১-১৭)	আকাইদ	১
	পার্ঠ ১-তাওহিদ	১
	পার্ঠ ২-কালিমা তাহিযা	৩
	পার্ঠ ৩-কালিমা শাহাদাত	৪
	পার্ঠ ৪-ইমান মুজমালা	৬
	পার্ঠ ৫-আল-আসমতিল হুসনা	৭
	পার্ঠ ৬-বিশালাত	৯
	পার্ঠ ৭-আখিরাত	১১
	পার্ঠ ৮-আকাইদ ও নৈতিকতা	১৩
	ইবাদত	১৮
দ্বিতীয় অধ্যায় ইবাদত (১৮-৪৩)	পার্ঠ ১-ইবাদতের ধারণা ও তাৎপর্য	১৯
	পার্ঠ ২-অপবিত্রতা	২১
	পার্ঠ ৩-পবিত্রতা	২২
	পার্ঠ ৪-তম্বু	২৩
	পার্ঠ ৫-তায়ামুম	২৫
	পার্ঠ ৬-শোসল	২৬
	পার্ঠ ৭-সালাত	২৭
	পার্ঠ ৮-সালাতের সময় সুটি	২৮
	পার্ঠ ৯-সালাত আদায়ের নিয়ম	২৯
	পার্ঠ ১০- সালাতের ফরয	৩১
	পার্ঠ ১১- সিজলাহ	৩৫
	পার্ঠ ১২- সিজলাহের তিলাওয়াত	৩৬
	পার্ঠ ১৩- সালাতের নৈতিক শিক্ষা	৩৭
	পার্ঠ ১৪- সালাতের নৈতিক শিক্ষা	৩৭
তৃতীয় অধ্যায় কুরআন ও হাদিস শিক্ষা (৪৪-৭৭)	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা	৪৪
	পার্ঠ ১-আল মুব্বাশের পরিচয়	৪৪
	পার্ঠ ২-কুরআন তিলাওয়াত	৪৬
	পার্ঠ ৩-তাওহিদ	৪৭
	পার্ঠ ৪-মাখরাজ	৪৮
	পার্ঠ ৫-সূরা আল-ফাতিহা	৫৬
	পার্ঠ ৬-সূরা আন-নাস	৫৮
	পার্ঠ ৭-সূরা আল-ফালাক	৬১
	পার্ঠ ৮-সূরা আল-হাযাহ	৬৩
	পার্ঠ ৯-সূরা আল-আসের	৬৬
	পার্ঠ ১০-অর্থসহ মুনাযাআতের তিনটি আয়াত	৬৮
	পার্ঠ ১১-আল হাদিস	৭০
	পার্ঠ ১২-অর্থসহ নৈতিক ও নৈতিক বিষয়ক দুটি হাদিস	৭১
	পার্ঠ ১৩-অর্থসহ মুনাযাআতমূলক দুটি হাদিস	৭২
চতুর্থ অধ্যায় আখলাক (৭৮-৯৭)	পার্ঠ ১৪-নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার হাদিস	৭৩
	আখলাক	৭৮
	পার্ঠ ১-আখলাকে হাদিসা	৭৯
	পার্ঠ ২-সত্যবাদিতা	৮০
	পার্ঠ ৩-পিতামাতার প্রতি কর্তব্য	৮১
	পার্ঠ ৪-আত্মীয়দের প্রতি কর্তব্য	৮৩
	পার্ঠ ৫-প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য	৮৪
	পার্ঠ ৬-বড়দের প্রতি মাহা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ	৮৬
	পার্ঠ ৭-সহপাঠীদের সাথে সম্বন্ধের	৮৭
	পার্ঠ ৮-আখলাকে হাদিসা	৮৮
	পার্ঠ ৯-মিথ্যাচার	৮৯
	পার্ঠ ১০-গিফত বা পরদিনা	৯০
	পার্ঠ ১১-গালি দেওয়া	৯১
	পার্ঠ ১২-খুশখব ও মালকাসাউ	৯২
	আদর্শ জীবন চরিত	৯৮
পঞ্চম অধ্যায় আদর্শ জীবন চরিত (৯৮-১১২)	পার্ঠ ১-হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জীবনাদর্শ	৯৮
	পার্ঠ ২-হযরত আবু বকর (রা.) এর জীবনাদর্শ	১০১
	পার্ঠ ৩-হযরত উমর ফারুক (রা.) এর জীবনাদর্শ	১০৩
	পার্ঠ ৪-হযরত হামিজা (রা.) এর জীবনাদর্শ	১০৫
	পার্ঠ ৫-হযরত ইমাম আবু হানিফা (হ.) এর জীবনাদর্শ	১০৭
	পার্ঠ ৬-হযরত আব্দুল কাদের গিলানী (হ.) এর জীবনাদর্শ	১০৮

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

প্রথম অধ্যায়

আকাইদ (الْعَقَائِدُ)

‘আকাইদ’ আরবি শব্দ। এটি বহুবচন। এর একবচন হলো ‘আকিদাহ’ (الْعَقِيدَةُ), যার অর্থ বিশ্বাস। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসমূহের প্রতি বিশ্বাসকেই ‘আকাইদ’ বলা হয়। যেমন- আদ্বাহ, নবি-রাসুল, ফেরেশতা, আসমানি কিতাব, আখিরাত/তকদির ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আকাইদের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- তাওহিদের (একত্ববাদ) ধারণা, তাৎপর্য ও তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- অর্ধসহ কালিমা তায়িবা ও কালিমা শাহাদাত শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ইমান মুজমাল (ইমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয়) অর্ধসহ শুদ্ধ উচ্চারণে পড়তে, বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আদ্বাহর কতিপয় গুণবাচক নামের অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রিসালাতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আখিরাতের ধারণা, বিশ্বাসের গুরুত্ব ও পর্যায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নৈতিকতা উন্নয়নে ‘আকাইদ’-এর গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ ১

তাওহিদ (التَّوْحِيدُ)

তাওহিদের ধারণা

তাওহিদ (تَوْحِيدٌ) আরবি শব্দ। বাংলা ভাষায় একে বলা হয় একত্ববাদ। আদ্বাহ তা’য়ালাকে এক ও অধিতীয় সত্তা হিসেবে বিশ্বাস করাকে তাওহিদ বা একত্ববাদ বলা হয়। আদ্বাহ তা’য়ালাই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিহিদদাতা। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। তিনিই হলেন একমাত্র ইলাহ। আদ্বাহ তা’য়ালার প্রতি এরূপ বিশ্বাসই হলো তাওহিদ।

আদ্বাহ তা’য়ালার পরিচয়

আদ্বাহ তা’য়ালার এক ও অধিতীয়। তিনি সত্তাগতভাবে যেমনি একক, তেমনি গুণাবলিতেও তুলনাহীন। অর্থাৎ মহান আদ্বাহ একক সত্তা। তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই। তিনি কারো সন্তান নন। আবার কেউ তাঁর সন্তানও নয়। গুণাবলির দিক থেকেও মহান আদ্বাহ অধিতীয়। তিনি সকল গুণের আধার। তিনি ডিরহ্মী, ডিরল্লী, শাখত ও সত্য। তিনি সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা, পুরস্কারদাতা, শাস্তিদাতা ইত্যাদি। তিনি ‘শা শারীক’। তাঁর সমান বা সমকক্ষ কেউ নেই। তাঁর গুণাবলির সাথে কোনো কিছুই তুলনা করা যায় না। তাঁর তুলনা একমাত্র তিনি নিজেই।

তাওহিদের তাৎপর্য

আমরা আমাদের চারপাশে নানারকম জিনিস দেখতে পাই। সুন্দর সুন্দর ফুল-কল, গাছপালা, তরুলতা, পশু-পাখি ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, সাগর-মহাসাগর। আরও আছে বিশাল আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি। আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না এমন অনেক বস্তু এবং প্রাণিও রয়েছে। এসব কিছুই সৃষ্টিজগতের অন্তর্গত। এগুলো সৃষ্টিকর্তা ছাড়া নিজ থেকে সৃষ্টি হয়নি। নিচয়ই একজন স্রষ্টা এগুলো সৃষ্টি করেছেন। তিনি হলেন মহান আত্মাহ। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোনো সাহায্যকারীর প্রয়োজন হয়নি। তিনি 'হও' (কুন) বলার সাথে সাথেই সবকিছু সৃষ্টি হয়ে যায়।

বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষ জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে এগুলো থেকে উপকার লাভ করে। সুতরাং মানুষের উচিত তার স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এক আত্মাহ তা'য়ালার অনুগত্য ও ইবাদত করা। তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করা যাবে না। এভাবে মহান আত্মাহর তাওহিদ বা একত্ববাদের প্রতি অনুগত হলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে কল্যাণ ও সফলতা লাভ করতে পারে।

তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহিদ বা আত্মাহ তা'য়ালার একত্ববাদে বিশ্বাস আকাহিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি হলো তাওহিদ। তাওহিদে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। সকল নবি-রাসুল (আ) তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন। সকলেই ঘোষণা করেছেন যে- আত্মাহ তা'য়ালার এক ও অধিতীয়। তাঁর তুল্য কিছুই নেই। তাওহিদে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করে। আর তাওহিদে বিশ্বাসীপণ আখিরাতে জান্নাত লাভ করবেন।

তাওহিদে বিশ্বাসের উদাহরণ

আমরা সকলেই হযরত ইবরাহিম (আ) এর নাম শুনেছি। তিনি ছিলেন একজন নবি ও রাসুল। তিনি এক মূর্তিপূজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। তাঁর সময়ের লোকজন আত্মাহ তা'য়ালার একত্ববাদে বা তাওহিদে বিশ্বাস করত না। বরং তারা মূর্তিপূজা করত। তাদের রাজা নমরুদের উপাসনা করত। হযরত ইবরাহিম (আ) এসব করতেন না। তিনি ভাবলেন মূর্তি বা নমরুদ কোনো কিছুর স্রষ্টা হতে পারে না। কেননা এগুলো নিজেরাই ধ্বংসশীল। সুতরাং এদের উপাসনা করা ঠিক নয়।

এভাবে তিনি স্রষ্টা সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলেন। প্রথমে তিনি ভাবলেন যে আকাশের তারকা, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি হয়তো মানুষের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু এগুলোর একে একে অদৃশ্য হয়ে গেলে তিনি বুঝতে পারলেন যে এগুলো মানুষের ইলাহ নয়। কেননা এগুলো কোনোটিই স্থায়ী নয়। এরা অস্ত যায়, অদৃশ্য হয়। বরং এ সবকিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন তিনিই ইলাহ, তিনিই মাবুদ। অতঃপর তিনি সে অদৃশ্য সত্তার প্রতি ইমান আনলেন ও তাওহিদে বিশ্বাস স্থাপন করলেন। এভাবে বিশ্বজগতের নানা সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহিম (আ) মহান আত্মাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

অতএব তাওহিদ অর্থ একত্ববাদ। আত্মাহ তা'য়ালার তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে এক ও অধিতীয়। আমরা তাওহিদে বিশ্বাস করব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। আত্মাহ তা'য়ালার সাথে কোনো কিছুকে শরিক করব না।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল তাওহিদের পরিচয় ও তাৎপর্য সম্পর্কে বলবে। অন্যদল একটি উদাহরণের মাধ্যমে তাওহিদে বিশ্বাসের গুরুত্ব সম্পর্কে বলবে।

পাঠ ২

কালিমা তায়্যিবা (كَلِمَةُ طَيِّبَةٌ)

কালিমা তায়্যিবা (كَلِمَةُ طَيِّبَةٌ)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

উচ্চারণ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই, মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল।

তাৎপর্য

কালিমা তায়্যিবা অর্থ হলো পবিত্র বাক্য। এটি তাওহিদ, ইমান ও ইসলামের মূলভিত্তি। এ কালিমা স্বীকার না করলে কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে না। এ কালিমার দু'টি অংশ।

প্রথম অংশ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা মাবুদ নেই। অর্থাৎ পৃথিবীতে ইলাহ বা ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হতে পারে না। চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, বাঘ-সিংহ, রাজা-বাদশাহ কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। বরং এসবের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাই হলেন একমাত্র মাবুদ। তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত বা উপাসনা করা যাবে না। এমনকি তাঁর ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক করাও যাবে না। আরবি 'লা ইলাহা' শব্দের অর্থ কোনো ইলাহ নেই; আর 'ইল্লাল্লাহ' অর্থ আল্লাহ ছাড়া। কালিমার এ অংশটি না-বোধক শব্দ দ্বারা শুরু করা হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কোনো পাঠে ভালো কিছু নেওয়ার আগে প্রথমে এই পাঠটি খালি করে ফেলি। যেন ঐ জিনিসটি অন্য কিছুর সাথে মিশ্রিত না হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোকা যাবে। যেমন- একটি গ্রাসে পানি রয়েছে। তুমি যদি ঐ গ্রাসে দুধ নিতে চাও তাহলে কী করবে? প্রথমে গ্রাসের পানটুকু ফেলে দেবে। তাই না? এরপর খালি গ্রাসে দুধ নেবে। গ্রাসে পানি রেখে দিয়ে তাতে দুধ নিলে দুধ আর পানি মিশ্রিত হয়ে যাবে। ফলে দুধের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যাবে। তদ্রূপ তাওহিদে বিশ্বাসের জন্ম প্রয়োজন পবিত্র অন্তর। অর্থাৎ প্রথমে অন্তর থেকে সব রকমের ভুল ও ভ্রান্তবিশ্বাস দূর করতে হবে। 'লা ইলাহা' দ্বারা এটাই করা হয়। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহ' দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হবে।

আমাদের ক্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) যখন মক্কা নগরীতে ইসলাম প্রচার শুরু করেন, তখন আরবের লোকেরা ছিল মূর্তিপূজক। তারা নানারূপ মূর্তি, পাছ-পালা, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির পূজা করত। এজন্য রাসূল (স.) এ কালিমার দাওয়াত দেন। ফলে আরবের লোকজন মূর্তিপূজা থেকে অন্তরকে পরিষ্কার করে আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে।

দ্বিতীয় অংশ : مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) অর্থ : মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর রাসূল। অর্থাৎ মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবি ও রাসূল। এ কথা উপর বিশ্বাস স্থাপন ইমানের অংশ। কালিমা তায়্যিবার প্রথম অংশের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যেমন জরুরি, দ্বিতীয় অংশের প্রতি ইমান আনাও তেমনিই আবশ্যক।

আব্দুল্লাহর এককভাবে বিশ্বাসের পাশাপাশি মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কেননা তাঁর মাধ্যমেই আমরা আব্দুল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করি। তিনিই আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ তা'য়ালার বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদি তিনিই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর এসব তিনি নিজ থেকে শিক্ষা দেননি। বরং মহান আব্দুল্লাহর নির্দেশেই শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আমরা বিশ্বাস করব যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আব্দুল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত বাণী। তিনি নবি ও রাসূল। তিনি যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা আব্দুল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। যাতে রয়েছে মানুষের জীবন পরিচালনার যথার্থ বিধি-বিধান।

কালিমা তায়্যিবা ইমানের মূলভিত্তি। অতএব, আমরা শুদ্ধভাবে এ কালিমা পড়ব। এর অর্থ বুঝে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করব এবং এর মর্মদুসারে জীবনের সকল কাজ পরিচালনা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকে বাড়ি থেকে বড় একটি কাগজে 'কালিমা তায়্যিবা' অর্থসহ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করে নিয়ে আসবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩

কালিমা শাহাদত (كَلِمَةُ شَهَادَةِ)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

উচ্চারণ : আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইব্রাহীম, ওয়াহদাহ, লা শারিকাহ, ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহ ওয়া রাসুলুহ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আব্দুল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (স.) তাঁর (আব্দুল্লাহর) বাণী ও রাসূল।

তাৎপর্য

কালিমা শাহাদাত হলো- সাক্ষ্য দানের বাক্য। অর্থাৎ এ কালিমা দ্বারা ইমানের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। আমরা এ কালিমা উচ্চারণের মাধ্যমে আব্দুল্লাহ তা'য়ালার এককবাদ ও মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করি।

আব্দুল্লাহ তা'য়ালার আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রব। তিনি আমাদের রিয়িক দেন, প্রতিপালন করেন, সুস্থতা দান করেন। তিনি আমাদের নানারূপ নিয়ামত দান করেন। আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য, সবকিছুই তাঁর দান। সুতরাং আমাদের উচিত তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অপরদিকে হযরত মুহাম্মদ (স.) আব্দুল্লাহ তা'য়ালার হেরিত নবি ও রাসূল। তিনিই আমাদের নিকট আব্দুল্লাহ পাকের পরিচয় ফুলে ধরেছেন। সত্য-মিথ্যার পার্থক্য শিখিয়েছেন। আল্লাতে যাওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুতরাং সকল কাজে তাঁর আনুগত্য করা এবং তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করাও অত্যাবশ্যক।

কালিমা শাহাদাতের মাধ্যমে আমরা এ দুটো কাজই করতে পারি। তাছাড়াও মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও হযরত মুহাম্মদ (স.) এর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের প্রমাণ দিতে পারি।

কালিমা তাল্লিমার নায় কালিমা শাহাদাতও দু'টি অংশে বিভক্ত। যথা- "

প্রথম অংশ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ (আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু, লা শারিকালাহু) অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই।

এ কথার দ্বারা তাওহিদ বা একত্ববাদের সাক্ষ্য দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা এর দ্বারা সাক্ষ্য দেই যে, মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে একক। তাঁর কোনো শরিক বা সমতুল্য নেই। ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা কাউকে তাঁর শরিক করি না।

দ্বিতীয় অংশ : وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু)।

অর্থ : আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে, নিচেরই মুহাম্মদ (স.) আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

কালিমার এ অংশ দ্বারা মুহাম্মদ (স.)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। অর্থাৎ আমরা স্বীকার করি যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবি ও রাসুল। তিনি নিজে আল্লাহ নন কিংবা আল্লাহর অংশও নন। বরং তিনি হলেন আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। তিনিও আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতেন।

তবে তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল। তিনি আল্লাহ তা'আলার বান্দা আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছেন।

কালিমা শাহাদাত ইমানের অন্যতম প্রধান বাক্য। এর দ্বারা মানুষ নিজ ইমানের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং আমরা শুদ্ধভাবে এ কালিমা পড়ব এবং এর মর্মার্থ অনুসারে আমল করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা একে অপরকে কালিমা শাহাদাত অর্থসহ মুখস্থ পোনাবে।

ইমান মুজমাল (إِيمَانٌ مُّجْمَلٌ)

أَمِنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقِيْلَتُ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهِ وَأَرْكَانِهِ-

উচ্চারণ : আমানতু বিদ্দাহি কামা হুয়া বি আসমাইহি ওয়া সিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামি'আ আহ্‌কামিহি ওয়া আরকানিহি ।

অর্থ : আমি ‘ইমান’ আনলাম আদ্বাহর উপর, ঠিক তেমনি যেমন আছেন তিনি, তাঁর সকল নাম ও গুণসহ । আর আমি তাঁর সকল ছকুম ও বিধি-বিধান গ্রহণ করে নিলাম ।

তাৎপর্য

‘ইমান’ শব্দের অর্থ বিশ্বাস । আর ‘মুজমাল’ অর্থ সংক্ষিপ্ত । অতএব, ইমান মুজমাল অর্থ সংক্ষিপ্ত বিশ্বাস । সংক্ষেপে আদ্বাহ তা’রালাহর প্রতি বিশ্বাস করা ও আনুগত্য স্বীকার করাকে ইমান মুজমাল বলা হয় । এ বাক্য দ্বারা আমরা পুরোপুরিভাবে আদ্বাহ তা’রালাহর কর্তৃত্ব ও বিধান স্বীকার করে থাকি ।

আদ্বাহ তা’রালা এক ও অবিভীদ্য । তিনি অভুলনীয় । কোনো কিছুই তাঁর তুল্য নয় । আবার তাঁর ন্যায়ও অন্য কিছু নেই । তাঁর সত্তা ঠিক তাঁরই মত । কোনো মানুষ তাঁর সত্তা, আকার আকৃতির কল্পনা করতে পারে না । তিনি যেমন আছেন সেরূপই তাঁকে বিশ্বাস করতে হবে । তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম রয়েছে । তিনি সকল গুণের অধিকারী । সবরকম গুণ তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় রয়েছে । এসব নাম ও গুণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে ।

মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি নানা আইন-কানুন প্রদান করেছেন । নবি-রাসুলগণ এগুলো মানুষের নিকট পৌঁছিয়েছেন । আদ্বাহ তা’রালাহর দেওয়া এসব বিধি-বিধান মানুষকে সফলতা ও মুক্তি দান করে । এগুলো অনুসরণ করলে, মেনে চললে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যায় । সুতরাং আমরা সর্বদা তাঁর আদেশগুলো মেনে চলব । যেসব কাজ থেকে মহান আদ্বাহ আমাদের নিষেধ করেছেন সেসব কাজ বর্জন করব ।

আমরা ইমান মুজমাল শুদ্ধরূপে পড়ব । এর অর্থ বুঝে আন্তরিকভাবে তা স্বীকার করব । আর জীবনের সর্বাবস্থায় এবং সকল কাজে আদ্বাহ তা’রালাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলব ।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বসে প্রত্যেকে ইমানে মুজমাল অর্থসহ নিজের খাতায় লিখে একে অপরকে দেখাবে ।

আল-আসমাউল হুসনা (الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)

আসমাউল হুসনা আরবি শব্দ। আসমা শব্দের অর্থ নামসমূহ। আর হুসনা অর্থ সুন্দর। অতএব, আসমাউল হুসনা অর্থ সুন্দর নামসমূহ। আদ্বাহ তা'হালাহর সুন্দর সুন্দর নামকে একত্রে আসমাউল হুসনা বলা হয়। পবিত্র কুরআনে আদ্বাহ পাক বলেন:

وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

অর্থ: আদ্বাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা তাঁকে সেই সব নামেই ডাকবে। (সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৮০)

আদ্বাহ তা'হালাহ সকল গুণের আধার। যেমন- তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, ক্ষমাশীল, দয়াবান, ধৈর্যশীল, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, প্রতিপালক ইত্যাদি। এমন কোনো গুণ নেই যা তাঁর মধ্যে নেই। এসব গুণের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক নাম রয়েছে। এগুলো হলো গুণবাচক নাম। গুণবাচক এসব নামই আসমাউল হুসনা। পবিত্র কুরআনে আদ্বাহ পাকের অনেক গুণবাচক নামের উল্লেখ আছে। আমরা আদ্বাহ পাকের ৯৯ (নিরানব্বই)টি গুণবাচক নামের কথা জানি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, মহান আদ্বাহর গুণবাচক নামের কোনো শেষ নেই। এগুলো অসংখ্য। তবে বেশি উল্লেখযোগ্য হলো এ নিরানব্বইটি নাম।

এসব নাম আদ্বাহ তা'হালাহর পরিচয় প্রকাশ করে। যেমন- আদ্বাহ হালিক। হালিক অর্থ সৃষ্টিকর্তা বা স্রষ্টা। সুতরাং আমরা এ নাম দ্বারা বুঝতে পারি যে, এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা হলেন মহান আদ্বাহ। এভাবে গুণবাচক নামসমূহ দ্বারা আমরা আদ্বাহ তা'হালাহকে ভালোভাবে চিনতে পারি। ফলে তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা সহজ হয়। আদ্বাহ তা'হালাহর এসব গুণ আমরা অনুশীলন করব। এতে আমাদের চরিত্র সুন্দর হবে। সকলেই আমাদের ভালোবাসবে। আদ্বাহ তা'হালাহ আমাদের ভালোবাসবেন।

আদ্বাহ মালিক (اللَّهُ مَالِكٌ)

আদ্বাহ তা'হালাহ সকল কিছুর মালিক। মালিক অর্থ অধিকারী। তিনি আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, নদী-সাগর সবকিছুর অধিপতি। সকল কিছুই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হয়। কোনো কিছুই তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করে না। পণ্ড-পাখি, কীট-পতঙ্গের মালিকও তিনিই। পৃথিবীতে বড়-ছোট সকল বস্তুই তাঁর মালিকানার অন্তর্ভুক্ত।

আদ্বাহ তা'হালাহ মানুষেরও মালিক। আমাদের জীবন-মৃত্যু তাঁরই নিয়ন্ত্রণে। আমাদের ধন-সম্পদ, পোশাক-পরিচর্যা সবকিছুর প্রকৃত মালিকও তিনিই। পৃথিবীতে আমরা তাঁর প্রতিদিন। এ হিসেবে আমরা ধন-সম্পদের আমানতদার মাত্র। আদ্বাহ তা'হালাহ কিয়ামত ও পরকালের মালিক। জাহান্নাম-জাহান্নাম তাঁরই অধিকারে। শেষ বিচারের দিনের মালিকও তিনিই। এক কথায় বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবকিছুরই মালিক হলেন মহান আদ্বাহ।

আদ্বাহ করিম (اللَّهُ كَرِيمٌ)

করিম আরবি শব্দ। এর অর্থ দয়াময়, মহানুভব, উদার ইত্যাদি। আদ্বাহ তা'হালাহ অতীব মহান, করুণাময়। উদারতা, দয়া, মায়া, স্নেহ, সহনশীলতা, ঔদার্য, ক্ষমা ইত্যাদি গুণাবলি পরিপূর্ণভাবে তাঁর সত্তায় বিদ্যমান রয়েছে। আদ্বাহ অসীম

তাই তাঁর মায়া, ক্ষমা, সহনশীলতা ইত্যাদি সীমাহীন। আমাদের কেউ কাউকে দয়া দেখালে, ক্ষমা করলে, আমরা ঐ ব্যক্তিকে কতইনা মহান ভাবি। আদর্শবান ব্যক্তি হিসেবে তার গুণগান করি। কিন্তু মহান আল্লাহ যে কত বড় দয়াময়, উদার, ক্ষমাশীল তা আমরা অনুমান ও করতে পারি না। কেননা তিনি তো মহামহিম অসীম সত্তার অধিকারী। তিনি সকল সৃষ্টির প্রতিই উদার ও মহানুভব। বায়ু, পানি, আলো, চন্দ্র, সূর্য, জীবজন্তু, পাহাড়-নদী, জমিন, আসমান সবই আল্লাহর নিয়ামত। বিনিময় প্রত্যাশা ছাড়া উদারভাবে অকাতরে তিনি সকলের প্রতি নিয়ামত বিতরণ করেন। তাঁর মহানুভবতার কোনো সীমা নেই। তাঁর এ অসীম এবং অক্ষুরন্ত দয়া, মায়া ও উদারতার জন্য সকলকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, শোকর আদায় করা উচিত।

মহান আল্লাহর গুণবাচক নামের অনুসরণে আমরাও অন্যের প্রতি উদার ও দয়াপূর্ণ আচরণ করব। কথায়, কাজে বাস্তব জীবনে মহানুভব হব।

আল্লাহ আলিম (اللَّهُ عَلِيمٌ)

আলিম আরবি শব্দ। এর অর্থ সর্বজ্ঞ অর্থাৎ যিনি সবকিছু জানেন বা যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। আল্লাহ তা'য়ালার হলেন আলিম। তিনি সকল জ্ঞানের আধার, তাঁর জ্ঞান অসীম। তাঁর জ্ঞানের পরিমাপ করা যায় না। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি আসমান জমিনের সবকিছুর খবরই জানেন। আমাদের সকল কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম তিনি জানেন। এমনকি আমরা অন্তরে যা চিন্তা করি তিনি সেগুলোও জানেন। আমরা যা কল্পনা করি বা স্বপ্ন দেখি সেগুলোও তাঁর জানার বাইরে নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক বলেন-

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

অর্থ: অন্তরে যা আছে আল্লাহ সে সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। (আলে ইমরান, আয়াত ১৫৪)

আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান সীমাহীন। তাঁর জ্ঞানকে কেউই ফাঁকি দিতে পারে না। ক্ষুদ্র পিপিলিকার সমস্ত খবরও তাঁর জানা। সমুদ্রের তলদেশে কিংবা মহানুভব কোথায় কী হচ্ছে সবই তিনি জানেন। মোটকথা সবই তাঁর জ্ঞানের আওতাধীন। সুতরাং আমরা সবসময় একথা মনে রাখব। আল্লাহ তা'য়ালার অসঙ্কট হন এমন কোনো কাজ করব না।

আল্লাহ হাকিম (اللَّهُ حَكِيمٌ)

হাকিম আরবি শব্দ। এর অর্থ প্রজ্ঞাময়, হিকমতের অধিকারী, সুবিজ্ঞ, সুনিপুণ কর্মদক্ষ। মহান আল্লাহর গুণবাচক নাম হিসেবে হাকিম অর্থ আল্লাহ তা'য়ালার অত্যন্ত প্রজ্ঞাময়, সুদক্ষ, সুনিপুণ ও হিকমতের মালিক। এই মহাবিশ্ব তিনি যেমন সর্বোত্তম দক্ষতার সাথে সৃজন করেছেন, তেমন মহা প্রজ্ঞা, সুনিপুণ ও সুদক্ষ কৌশলের সাথে আবহমানকাল থেকে পরিচালনা করছেন। আকাশের তারকারাজি, চন্দ্র, সূর্য, মেঘমালা, নদ-নদী, বায়ু, আগুন-পানি, ফুল-ফল, বৃক্ষ-লতা, আসমান-জমিন, জীবন-মরণ, ঋতু-গছ ও রূপ-রস যে দিকেই আমরা তাকাই সর্বত্রই এক সুন্দর সুনিপুণ কৌশল দেখতে পাই। তাহিতো মহান আল্লাহ বলেন,

“যিনি সৃষ্টি করেছেন জ্বরে জ্বরে সজ্জাকাল। দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো ভুল দেখতে পাবে না; তুমি আবার তাকিয়ে দেখ, কোনো ত্রুটি দেখতে পাত কি?” (সূরা আল-মুলক, আয়াত ৩)

মহান আল্লাহর মহা প্রজ্ঞার নিদর্শন দেখে আমরা তাঁর প্রতি সুদৃঢ় ইমান আনব, শ্রদ্ধায় বিনম্রভাবে তাঁকে শ্রদ্ধা করব। সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে প্রজ্ঞা ও হিকমত বিদ্যমান তা উপলব্ধি করে নিজেরা চিন্তাশীল হব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চর্চার উৎসাহী হব। যাঁটি ইমানদার হওয়ার পাশাপাশি অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানমনস্ক হব। আমাদের লেখাপড়া ও দৈনন্দিন কাজকর্ম তাহিয়ে সুশৃঙ্খল-সুনিপুণভাবে সময়ানুবর্তী হয়ে সমাপন করতে চেষ্টা করব। তাতে আমাদের জীবন সার্থক ও সফল হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আল্লাহর চারটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করে প্রত্যেকটির একটি করে শিক্ষা লিখে প্রেমি শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

রিসালাত (الرِّسَالَةُ)

রিসালাত শব্দটি আরবি। এর অর্থ বার্তা, খবর, চিঠি বা সংবাদ বহন। রাসূলগণ যে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করেন তাকে বলা হয় রিসালাত। আল্লাহ তা'আলা নবি-রাসূলগণকে নানা দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। যেমন: মানুষকে আল্লাহ তা'আলার নিকে আহ্বান করা, সত্য দীন প্রচার করা, সত্য ও ন্যায়ের পথে চলা, মহান আল্লাহর বাণী পৌছে দেওয়া ইত্যাদি। রাসূলগণের এ সকল দায়িত্বকে এক কথায় রিসালাত বলা হয়।

ইসলামি আকিদায় তাওহীদে পরই রিসালাতের স্থান। এক্ষেত্রে নবুয়ত ও রিসালাত প্রায় সমার্থক।

নবি-রাসূলগণের পরিচয়

নবি-রাসূলগণ হলেন মহান আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা মনোনীত বান্দা। নবুয়ত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের নির্বাচিত করেছেন। যিনি নবুয়তের দায়িত্ব পালন করেন তিনি হলেন নবি। আর রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে বলা হয় রাসূল।

নবি-রাসূলগণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত পুরুষ। তাঁরা কেউ আল্লাহর অংশ বা আল্লাহ তা'আলার পুত্র ছিলেন না। বরং মানুষের মধ্য থেকেই আল্লাহ পাক তাঁদের নির্বাচন করেছেন। তাঁরা বিশেষ স্বাধীন ও মর্যাদার অধিকারী। তাঁরা মা' সুম বা নিষ্পাপ ছিলেন। তাঁরা সর্বদা নেক ও ভালো কাজ করতেন। অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতেন। তাঁরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

নবি-রাসূলগণ মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলার পরিচয় তুলে ধরেন। তাঁরা মানুষকে মহান আল্লাহর নিকে দাওয়াত দিতেন। মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের শিক্ষা দিতেন। তাঁরা মানুষের নিকট আল্লাহ তা'আলার বাণী ও বিধান পৌছে দিতেন। আল্লাহ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে মানুষকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। তাঁরা সবসময় মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন।

নবি ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যাদের নিকট আসমানি কিতাব এসেছিল তাঁরা ছিলেন রাসূল। আর যাদের নিকট কোনো আসমানি কিতাব আসেনি তাঁরা হলেন নবি। নবীরা পূর্ববর্তী রাসূলের প্রচারিত দীন (ধর্ম) প্রচার করতেন। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে অনেক নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যই নবি-রাসূল এসেছেন। এক মতে, তাঁদের সংখ্যা সর্বমোট এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। অন্যমতে, তাঁদের সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে মাত্র ৩১৩ (তিনশত তের) জন ছিলেন রাসূল। (মিশকাত : বাব-বাসউল খালক ওয়া জিকরিল আযিয়া) অতএব বোঝা যায় প্রত্যেক রাসূলই নবি ছিলেন, কিন্তু প্রত্যেক নবি রাসূল ছিলেন না। সর্বপ্রথম নবি ছিলেন হযরত আদম (আ.)। আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল আমাদের প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। তাঁরপর দুনিয়াতে আর কোনো নবি আসেননি, আসবেনও না।

নবি-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা

মহান আল্লাহ নানা কারণে মানুষের মধ্যে নবি-রাসূল প্রেরণ করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

- নবি-রাসূলগণ মানুষকে আল্লাহ পাকের পরিচয় জানিয়েছেন।
- তাঁরা আমাদের আল্লাহ তা'য়ালার ও সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করতেন।
- ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির পার্থক্য নবি-রাসূলগণই শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা মানুষকে উন্নত ও উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা জাহান্নাতে যাওয়ার পথ নির্দেশ প্রদান করতেন। কীভাবে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বেঁচে থাকা যায় সে শিক্ষা দিতেন।
- তাঁরা মানুষের নিকট আসমানি কিতাবসমূহের বাণী পৌঁছে দিতেন।
- হাতে-কলমে মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার বিধান শিক্ষা দিতেন।

রিসালাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

রিসালাতে বিশ্বাস করার গুরুত্ব অপরিমিত। তাওহীদের পরই রিসালাতের স্থান। রিসালাতে অর্থাৎ নবি-রাসূলগণকে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারে না। কেননা নবি-রাসূলগণই আমাদের আল্লাহ তা'য়ালার পরিচয় জানিয়েছেন। তাঁর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁদের বিশ্বাস না করলে আল্লাহ তা'য়ালার ও তাঁর বানীকে অস্বীকার করা হয়। অতএব ইমানের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

নবি-রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় বান্দা ও প্রেরিত মানব। মানুষের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহর প্রেরিত সব নবি-রাসূলের প্রতি আমরা ইমান আনব। তাঁদের আনিত বানীকে সম্মান করব। আর সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সেখানেও পথে আমাদের জীবন পরিচালনা করব।

কাছ : শিক্ষার্থীরা নবি-রাসূল প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা খাতায় লিখে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে দেখাবে।

বিহিয়ে নিজ হাতে পাথরটি চাদরের মাথখানে রাখলেন। তারপর সকল গোত্রের সরদারকে ডেকে চাদর ধরতে বললেন। তারা সকলে মিলে চাদরটি বহন করে যথাস্থানে নিয়ে গেল, হযরত মুহাম্মদ (স.) নিজ হাতে পাথরখানা কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। ফলে জাতি একটি উন্মাদহ মুক্ত হতে বেঁচে গেল এবং সকলে পাথরটি বহনের সম্মান পেয়ে খুশি হলেন।

নবুয়ত প্রাপ্তি ও আরবের লোকদের প্রতিক্রিয়া

হযরত মুহাম্মদ (স.) শৈশবকাল হতেই মানুষের মুক্তি ও শান্তির কথা ভাবতেন। যুবক বয়সে তাঁর এ ভাবনা আরও গভীর হতে থাকে। হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহের পর তিনি সাধনা ও ধ্যান আরও বাড়িয়ে দেন। তিনি মক্কার অদূরে হেরা গুহায় গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি সর্বদা চিন্তা করতেন, কীভাবে মানব জাতিকে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা ও শিরক হতে মুক্ত করবেন ও এক আল্লাহর পথে নিয়ে আসবেন। এভাবে তিনি হেরা গুহায় একটানা ১৫ বছর ধ্যান-মগ্ন থাকেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসের ২৭ তারিখ নবুয়ত লাভ করেন।

নবুয়ত লাভের পর তিনি লোকদের এক আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দেন। মক্কার কফিররা তাতে বাধা দেয়। তাই তিনি গোপনে ইসলামের পথে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। আরবের প্রভাবশালী মহল সবসময় তাঁর কাজের বিরোধিতা করতে থাকে। তারা হযরত মুহাম্মদ (স.) ও তাঁর অনুসারীদের নানাভাবে নির্যাতন করতে থাকে। হযরত মুহাম্মদ (স.) অত্যন্ত মৈথসহকারে তাদের অত্যাচার সহ্য করেন এবং নীরবে এক আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে থাকেন। হযরত মুহাম্মদ (স.) আরব সমাজের কুসংস্কার দূর করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

পাঠ ২

হযরত আবু বকর (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম আব্দুল্লাহ, উপাধি সিদ্দিক ও আতিক। পিতার নাম ওসমান, ডাকনাম আবু কুহাফা এবং মাতার নাম সালমা, ডাকনাম উম্মুল বায়র। তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন বয়সের দিক থেকে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর চেয়ে তিন বছরের ছোট। মহানবি (স.)-এর প্রায় সমবয়সী হওয়ায় হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি উম্মুল মোমেনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতা ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর স্বস্তর।

ইসলাম গ্রহণ

পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন হযরত আবু বকর (রা.)। তিনি রাসূল (স.)-কে খুব বিশ্বাস করতেন। একদা তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়ামেনে গমন করেন। মক্কায় ফিরে তখনলেন হযরত মুহাম্মদ (স.) নবি দাবি করছেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করছেন। তিনি রাসূল (স.)-এর দরবারে হাজির হয়ে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

চরিত্র ও গুণাবলি

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন স্বল্পভাষী, সাহসী, দৈর্ঘশীল, বিচক্ষণ ও দূরদর্শী। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি ছিল তার অটল বিশ্বাস। রাসূল (স.)-এর মে'রাজের (উম্ম্বগমন) ঘটনা অকপটে একমাত্র তিনিই বিশ্বাস করেন। তাই তিনি সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত হন। সত্যতা, ধর্মভিরাগতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। দুঃখী ও আতের সেবায় তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। এজন্য তিনি আরব সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তিনি ছিলেন নম্র ও ভদ্র প্রকৃতির লোক। কুরআন পাঠের সময় তাঁর দৃষ্টিচোখ দিয়ে অশ্রু বরতো। ইসলামের সেবায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দান অতুলনীয়। তিনি ইসলামের জন্য তাঁর সর্বথ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। মসজিদে নববি ও হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাসগৃহ নির্মাণ এবং তবুক অভিযানে তিনি অর্থ ব্যয় করেন। তিনি হযরত বেলাল (রা.)-সহ অসংখ্য ক্রীতদাসকে রক্ত করে স্বাধীন ও মুক্ত করে দেন।

ইসলাম প্রচার

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) রাসূল (স.)-এর সঙ্গে ইসলাম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। মক্কার আশেপাশের গোত্রে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। হজের মৌসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়েও তিনি ইসলামের প্রতি লোকদের আহবান করেন। তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট যুবক ওসমান (রা.), হুবাইর (রা.), আবুর রহমান ইবনে আউফ (রা.), সা'দ (রা.), ত্বালহা (রা.)-এর মত আরও অনেক সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেন।

মদিনায় হিজরত

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হিজরতের সাহাী ছিলেন। রাসূল (স.) হিজরতের আদেশ

প্রাণ হন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে অবগত করেন। তিনি রাসুল (স.) থেকে হিজরতের কথা শুনার পর রাতে আর ঘুমাতেন না, অপেক্ষায় থাকতেন কখন রাসুল (স.) এসে তাঁর সাথে হিজরত করার জন্য ডাক দেবেন। গভীর রাতে তিনি রাসুল (স.)-এর ডাকে সাড়া দেন এবং উভয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হন। পথিমধ্যে তারা কাফির শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাগুর নামক পর্বতের স্তহায় আশ্রয় নেন। সেখান থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

খলিফা নির্বাচন

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ওফাতের পর হযরত উমর (রা.) ও অন্য সাহাবিগণ হযরত আবু বকর (রা.)-কে খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে পরামর্শ করে তাঁকে ৮ জুন ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম জাহাঙ্গিরে প্রথম খলিফা নির্বাচন করেন। রাসুল (স.)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ সময় কিছু লোক নবি হওয়ার মিথ্যা দাবি করে, আবার কেউ কেউ যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, কেউ কেউ ইসলাম ত্যাগ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কঠোরভাবে সমস্ত বিশৃংখলা দূর করেন ও শান্তি স্থাপন করেন। তাঁর শাসনামলে ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধে অনেক হাফেজ ও কুরি সাহাবি শহিদ হন। এরপর তিনি কুরআন সংরক্ষণ ও সংগ্ৰহ করার জন্য হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-কে নির্দেশ দেন। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন সাহাবি থেকে পাছের বাকলে, পত্তর হাড় ও চামড়ায় এবং মসৃন পাথরে লিখিত কুরআনের আয়াতসমূহ সংগ্ৰহ করেন।

ওফাত

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ২৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি ৬৩ বছর জীবিত ছিলেন। তাকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর কামরায় হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পাশে মদিনায় সমাধিত করা হয়।

রাসুল (স.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম রক্ষায় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর আদর্শ সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রেনিকক্ষে হযরত আবু বকর (রা.)-এর চরিত্রের দুটি গুণ লিখে একটি প্র্যাকার্ড তৈরি করবে।

পাঠ ৩

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর জীবনাদর্শ

পরিচয়

হযরত উমর ফারুক (রা.) ছিলেন মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা। তিনি ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশের আদি গোত্রের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাকনাম আবু হাফস, পিতার নাম খান্সাব, মাতার নাম হানুতামা। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ফারুক (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী) উপাধিতে ভূষিত হন। বাল্যকালে তিনি উট চড়াতেন, বৌবনের চরকে মুফবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ তালিকা সম্পর্কে পারদর্শী ছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সময় কুরাইশ বংশে ১৭ জন ব্যক্তি লেখাপড়া জানতেন, তিনি তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উমর ফারুক (রা.) ইসলাম গ্রহণের আগে আবু জাহালের নেতৃত্বে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। তিনি মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়ন চালাতেন। এমনকি তাঁর চাকরানীও ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি তার উপর নির্ধাতন করা থেকে বিরত থাকেন নি। মক্কার 'শারুন নদওয়া' বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একশত উট পুরস্কার পাওয়ার আশায় তিনি উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে মুহাম্মদ (স.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হন। পথে নঈম ইবন আব্দুল্লাহর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। নঈম বললো, 'কোথায় যাচ্ছে উমর?' উত্তরে রাগত্বরে বললেন, মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। একথা শুনে নঈম বললো, আগে তোমার ঘর সামলাও। তোমার বোন ফাতিমা ও ভগ্নিপতি সাঈদ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে বোনের বাড়ি গেলেন। তাঁর বোন ও ভগ্নিপতি তখন পবিত্র কুব্বারের সূরা ত্বাহা পাঠ করছিলেন। এমনভাবে হযরত উমর (রা.)-এর উপস্থিতি তাদের মধ্যে তীব্র সন্ধার করলেও তাঁরা ইমামি চেতনা থেকে সরে যান নি। হযরত উমর (রা.)-এর জিজ্ঞাসাবাসে তাঁরা কুরআন পাঠের কথা জানান। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁদের উপর আঘাত করতে থাকেন। তখন তাঁর বোনের শরীর থেকে রক্ত বরা সেখে তাঁর মনে দয়ার উদ্রেক হয়। হযরত উমর (রা.) তাঁদের বললেন, তোমরা কী পাঠ করছিলে তা আমাকে দেখাও। উত্তরে তাঁর বোন বললো, কুরআন পাঠ করছিলাম। এটা পবিত্র গ্রন্থ, অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। পরে তিনি পবিত্র হয়ে এলে তাঁকে কুরআন মাজিদ পড়তে দেয়া হয়। তখন তাঁর মনে চিন্তার পরিবর্তন হয়। তিনি তখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাসূল (স.)-এর নিকট যাতায়াতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সে সময় রাসূল (স.) সাক্ষাৎ পাহাড়ের পাদদেশে হযরত আরকাম (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। কোষমুক্ত তরবারিসহ হযরত উমর (রা.)-এর উপস্থিতি সাহাবিদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। হযরত উমর (রা.) রাসূল (স.)-এর পায়েব কাছে কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "হে আব্দুল্লাহর নবি! আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করুন। যে তরবারি নিয়ে আপনার শিরঃজন্দের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, আজ হাতে সে তরবারি উমরের হাতে ইসলামের শত্রু নিধনে ব্যবহৃত হবে।" হযরত উমর (রা.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাতে তখন ইসলাম গ্রহণ করেন। মূলত তাঁর ইসলাম গ্রহণ ছিল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দোয়ারই ফল। রাসূল (স.) তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করেন, "হে আব্দুল্লাহ! উমর ইবনে হিশাম (আবু জাহাল) অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব এ দু'জনের একজনকে ইসলামে প্রবেশ করার তৌফিক দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করুন।"

খলিফা নির্বাচন

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত উমর (রা.)

৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় বলিষ্ঠা নির্বাচিত হন। তা অধিকাংশ সাহাবি সমর্থন করেন।

শাসন ব্যবস্থা

হযরত উমর (রা.) বলিষ্ঠা নির্বাচিত হওয়ার পর মুসলিম সম্রাজ্য বিস্তারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। এ সময় রোম, পারস্য, সিরিয়া, মিশর ও ফিলিস্তিন মুসলিম সম্রাজ্যভুক্ত হয়। রাজ্য শাসনে তিনি রাসূল (স.)-এর আদর্শ অনুসরণ করতেন। আইনের চোখে সকলকে সমানভাবে দেখতেন। এমনকি মন্যমানের অপরাধে শীঘ্র পুত্র আবু শামাকে শাস্তিদানে বিন্দুমাত্র বিধা করেন নি। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তিনি ছিলেন যেমন কঠোর তেমনি মানুষের দুঃখ-কষ্টে তিনি ছিলেন অতি কোমল। তিনি সাধারণ প্রজাদের অবস্থা জানার জন্য রাতের আঁধারে একাকী বের হয়ে পড়তেন। প্রয়োজনে তিনি নিজের কাঁধে খাদ্যসামগ্রী বহন করে গরিব-দুঃস্থ মানুষের মাঝে বিতরণ করতেন। তাঁর শাসনামলে রাজ্যে কোনো অভাব-অনটন ছিল না। সে সময় কৃষিকাজে ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। তিনি ডাক বিভাগ প্রবর্তন, সাদ্য ও ন্যায়ের বাস্তব শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিজরি সন প্রবর্তন করেন। জনকল্যাণে তিনি অসংখ্য মসজিদ, বিদ্যালয়, সেতু, সড়ক, হাসপাতাল নির্মাণ করেন। পানির জন্য তিনি অনেক খালও খনন করেন। তাঁর সময়েই আরবে সর্বপ্রথম আদমশ্রমারি চালু হয়। ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় তিনি বাইতুলমাল থেকে প্রাপ্ত কাশড় সেই পরিমাণ গ্রহণ করতেন যে পরিমাণ সকলের জন্য নির্ধারিত ছিল। তাছাড়া জেরুজালেমে যাত্রার পথে ভৃত্যকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরার দৃষ্টান্ত একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরল ঘটনা। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, “অল্প কথায় বলা যায়, হযরত উমর (রা.)-এর সরলতা ও কর্তব্যজ্ঞান ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। ন্যায়পরায়ণতা ও একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর শাসনামলের মূলনীতি।”

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত উমর (রা.) খুব সহজ সরল ও অন্যাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। অর্থপৃথিবীর শাসক হয়েও তাঁর কোনো দেহরক্ষী ছিল না, খেজুরপাতার আসন ছিল তাঁর সিংহাসন। জনসেবাই ছিল তাঁর ব্রত। ইবাদত বন্দেগিতে অতিবাহিত হত তাঁর অধিকাংশ সময়। জাগতিক লোভ-লালসা ও জীকজমক তাঁকে স্পর্শ করে নি। তাঁর মধ্যে কঠোরতা ও কোমলতার ব্যাপক সমন্বয় ঘটেছিল।

শাহাদতবরণ

হযরত উমর (রা.)-এর শৌর্যবময় শাসনামলে দশম বছরে মসজিদে নববিতে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। এমনভাবেই কুফার শাসনকর্তা মূশীরার ভৃত্য লুলুর বিদ্রোহ চুরিকাঘাতে আহত হন। তিনি আহত হওয়ার তৃতীয় দিন হিজরি ২৩ সনের ২৭ জিলহজ্জ বুধবার (৩রা নভেম্বর) ৬৩ বছর বয়সে শাহাদতবরণ করেন। হযরত ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, “আমরা ধারণা হযরত উমর (রা.) যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, তখন দশভাগ ইলমের নয়ভাগ তিনি সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন।” আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর মহান আদর্শ মেনে চলব এবং সে অনুসারে জীবন গড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায়বিচার ও সুশাসন সম্পর্কে বাড়ির কাজ হিসেবে একটা টীকা লিখে নিয়ে আসবে।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর জীবনদর্শ

পরিচয়

মহানবি (স.)-এর প্রথম স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আব্দুল উয্বা নামক পরিবারে ৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন খোয়াইলিন ইবনে আসাদ আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তি। তাঁর মাতা ফাতিমা বিনতে যাহেক। বিশ্বের ইতিহাসে যে কয়জন নারী এসিদ্ধি লাভ করেছেন, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। সম্পর্কের দিক থেকে তিনি ছিলেন রাসূল (স.)-এর চাচাতো বোন। তাঁর উপাধি ছিল ‘তাহিরা’ (পুণ্যবতী)। পারিবারিক সূত্রে সম্পদশালিনী বলে তাঁর সুনাম ছিল সমগ্র আরবজুড়ে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর সঙ্গে পরিচয় ও বিবাহ

হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় লোক নিয়োগ করতেন। তিনি মহানবি (স.)-এর সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে তাঁকে তার ব্যবসা সেবাশ্রম করার জন্য অনুরোধ করেন। মহানবি (স.) তার ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি তার ব্যবসায়িক কাজে মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় গমন করেন। এ ব্যবসায় হযরত খাদিজা (রা.) ব্যাপক লাভবান হন।

হযরত মুহাম্মদ (স.) সিরিয়া থেকে ফেরার পর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সততা, বিশ্বস্ততা ও উন্নত চরিত্র সম্পর্কে অবগত হন। তিনি যুবক মুহাম্মদ (স.)-এর অসাধারণ চরিত্রগুণে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স ছিল তখন ২৫ বছর। আর হযরত খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর। রাসূল (স.)-এর চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে বিশটি উট মোহরের বিনিময়ে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সকল সম্পদের দায়-দায়িত্ব রাসূল (স.)-এর ওপর ছেড়ে দেন এবং নবি করিম (স.)-কে তাঁর ইচ্ছামত সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেন। রাসূল (স.) অকাতরে সম্পদ পরিব-দুঃখীদের মধ্যে দান করেন।

সন্তান-সন্ততি

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দাম্পত্য জীবন ছিল অত্যন্ত সুখের। হযরত খাদিজা (রা.)-এর গর্ভে মহানবি (স.)-এর তিন পুত্র সন্তান-কাছিম, আব্দুল্লাহ ও তাহির এবং চার কন্যা-হযরত জহান্নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসুম ও ফাতিমা (রা.) জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু পুরো পৈশবেই দুনিয়া হতে বিদায় নেন। তাতে নবি করিম (স.) অত্যন্ত মর্মান্তিক হন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত খাদিজা (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। হেরা গুহায় নবুওয়্যাতপ্রাপ্ত হয়ে মহানবি (স.) যখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে ছিলেন তখন হযরত খাদিজা (রা.) খাঁর খামীর অবস্থা বুঝতে পেরে বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁকে এ বলে সান্তনা দেন যে, ‘ভীত হওয়ার কিছু নেই, আল্লাহ আপনাকে অপদাঙ্ক করবেন না, কেননা আপনি আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন, দুঃখ অভাবীদের সাহায্য করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করেন’ এরপর হযরত খাদিজা (রা.) আসমানি কিতাবে অভিজ্ঞ গুয়ারাকা ইবনে নাওফেলের কাছে তাঁকে নিয়ে যান। গুয়ারাকা হেরা গুহায় সংঘটিত ঘটনা শুনে বললেন, ‘ভীত হওয়ার কিছু নেই, তিনি সে ‘নামূল’ (জিবরাঈল) যিনি হযরত

মুসা (আ.)-এর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন।' পরবর্তীকালে মহানবি (স.) আত্মাহুত নির্দেশে ইসলাম প্রচার শুরু করলে হযরত খাদিজা (রা.) সর্ব প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি নবুয়তের দশম বছরে রমজান মাসে ইম্বিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে নবি করিম (স.) গভীরভাবে শোকাহত হন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত খাদিজা (রা.) জাহেলি যুগে জন্মগ্রহণ করেও সং চরিত্রের অধিকারিণী ছিলেন। কখনো কোনো অন্যায় ও অশ্লীল কাজে যোগ দেননি। মহানবি (স.)-এর প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ভালোবাসা। তিনি ইসলাম প্রচারে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে সাহস ও উৎসাহ প্রদান করতেন। ইসলামের খাতিরে তাঁর সকল সম্পদ দান করার কারণে আত্মাহুত তাঁর উপর সঞ্চিত ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয়। যখন রাসুল (স.) বাইরে যেতেন তিনি কিরে না আসা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করতেন। আবার তিনি (স.) কখনো বিমর্ষ অবস্থায় বাড়ি ফিরলে হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সহানুভূতির সাথে সাঙ্খ্য দিতেন ও সাহস যোগাতেন।

শ্রেষ্ঠত্ব

মহানবি (স.) বলেছেন: হযরত খাদিজা (রা.) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নারী (বুখারি)। একদা হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত খাদিজা (রা.) সম্পর্কে রাসুল (স.)-কে বললেন, তাঁর প্রভু (আত্মাহুত) এবং আমার পক্ষ থেকে তাঁকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং তাকে জান্নাতের সুসবোদ দিবেন (বুখারি-মুসলিম)। আরও বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আয়েশা (রা.)-এর এক অভিমানের জবাবে রাসুল (স.) বলেন, 'না, আত্মাহুত খাদিজার চেয়ে কোনো মহৎ নারী আমাকে দেননি। তিনি এমন সময় আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছেন। আমার বিপদের দিনে সবাই যখন আমাকে নিরাশ করেছে তখন তিনি আমাকে অর্ধ সাহায্য করেছেন।' (মুসনায়ে আহমদ) অন্য এক হাদিসে 'নবি করিম (স.) বলেছেন, 'বিশ্বের সকল নারীর উপর চার জনের সন্মান রয়েছে- হযরত মারিয়াম (আ.), হযরত খাদিজা (রা.), হযরত ফাতিমা (হ.) ও হযরত আসিয়া (রা.)। বর্তমান বিশ্বের নারীগণ যদি হযরত খাদিজা (রা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে, তাহলে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন অনেক সুন্দর হবে।

কাজ: হযরত খাদিজা (রা.)-এর উত্তম গুণাবলির আলোকে একটি তালিকা তৈরি করবে।

হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর জীবনাদর্শ

জন্ম পরিচয়

হানাফি মাহযাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরি ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম নোমান, পিতার নাম ছাবিত। কিন্তু তিনি আবু হানিফা নামে খ্যাত।

শৈশবকাল

জন্মগতভাবেই ইমাম আবু হানিফা (র.) অসাধারণ মেধার অধিকারী ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআনের হাফিজ হন। তিনি কুরআন হাদিস ও ফিকহশাস্ত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি তৎকালীন মুহাদিস ও ফকিহ হাম্মাদ (র.)-এর কাছে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা করে জীবন নির্বাহ করতেন।

অবদান

ইমাম আবু হানিফা ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকহশাস্ত্রবিদ। মানুষ যাতে সহজ ও সঠিকভাবে শরিয়তের বিষয়গুলো পালন করতে পারে সে জন্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ফিকহবিদদের সমন্বয়ে একটি 'ফিকহ সম্পাদনা পরিষদ' গঠন করেন। তাঁর সম্পাদিত প্রায় তিরিশি হাজার মাসআলা সংবলিত 'কুতুবে হানাফিয়া' রচিত হয়। ইমাম আবু হানিফা কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের সমন্বয়ে মুক্তি-ভিত্তিক ও সহজ-সরল ফিকহ প্রণয়ন করেন। এ কারণে তাঁর ফিকহ মুসলমানদের নিকট অতিপ্রিয়। বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে তাঁর মাহযাবের অনুসারী বেশি। ইমাম আবু ইউসুফ (র.), ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম যুফার (র.) ও প্রখ্যাত মুহাদিস ইমাম ইবন যুবারক (র.) প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন।

ইমাম শাফেঈ (র.) তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'মানুষ ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মুখাপেক্ষী।' ব্যক্তি হিসাবে ইমাম আবু হানিফা ছিলেন উচুমানের ইবাদতকারী ও মুত্তাকি। কথায় ও কাজে তাঁর অপূর্ব মিল ছিল। তাঁর জীবনে কোনো লোভ-লালসা ছিল না। তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন।

আব্বাসি খলিফা আল মানসুর তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে তাঁকে দৈনিক নির্বাতন ও কারাবরণ করতে হয়। তিনি ১৫০ হিজরী ৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা আল মানসুর কর্তৃক প্রয়োগকৃত বিধিক্রমার ফলে কারাগারেই শাহাদতবরণ করেন।

আমরা ইমাম আবু হানিফা (র.) সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞানব এবং তাঁর ফিকহশাস্ত্রের উপর জ্ঞান লাভ করে সুন্দর জীবন গড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে বসে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর ফিকহশাস্ত্রে জ্ঞানের জনপ্রিয়তা লাভের কারণগুলো চিহ্নিত করবে।

পাঠ ৬

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর জীবনাদর্শ

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) ৪৭০ হিজরী মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে ইরানের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাকে জিলানী বলা হয়। তাঁর উপনাম আবু সালেহ, উপাধি মুহিউদ্দীন, কুতুব রাক্বানি ইত্যাদি। তার পিতার নাম আবু সালেহ মুসা। তিনি হযরত কাতেমা (রা.)-এর পুত্র ইমাম হাসান (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। তাঁর মাতার নাম উম্মুল খায়ের ফাতিমা। তিনি ইমাম হোসাইন (রা.)-এর বংশধর ছিলেন। এজন্যে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-কে আওলাদে রাসুল বলে গণ্য করা হয়।

এ মহান ওলি বালাকাল হতেই শান্ত, নম্র, ভদ্র, চিত্তাশীল ও জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। শৈশবে তিনি কুরআন মুখস্থ করেন। জিলানে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর ১৮ বছর বয়সে উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বাগদাদ গমন করেন। নিজামিয়া মাদ্রাসায় তাফসির, হাদিস, ফিকহ, উসূল, ধর্মতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস ও দর্শনে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রমী একজন মহান সাধক ও তাপস হবেন তা তার শৈশবকালের একটি কাহিনী থেকে বোঝা যায়। বর্ণিত রয়েছে যে, দুধপোষা অবস্থায় তিনি রমযান মাসে দিনের বেলায় মাতৃদুধ পান থেকে বিরত থাকতেন। তাঁর মা তাকে দুধ পান করাতে গেলে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) শরিয়তের জানার্জনের পর মা'রফাতের (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান লাভের জন্য বাগদাদের সুফি-দরবেশদের দরবারে যাতায়াত শুরু করেন। তাঁর সাথে সাধক হযরত হাম্বাদান (রা.)-এর পরিচয় ঘটে। তিনি তাঁর সাহচর্যেই সুফি-তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করেন।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য ২৫ বছর লোক-চক্ষুর অন্তরালে চলে যান। ৫২১ হিজরীর শেষ ভাগে পুনরায় লোকালয়ে ফিরে আসেন এবং দীন প্রচার শুরু করেন।

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর নিকট শিক্ষা লাভের জন্য অসংখ্য আলেম সমবেত হতেন। তিনি বুধবার স্থানীয় ঈদগাহে সকাল বেলায় বক্তৃতা করতেন। কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ঈদগাহটির আয়তন বৃদ্ধি করা হয় এবং সেখানে একটি মুসাফিরখানাও স্থাপন করা হয়।

জীবনের শেষ দিকে তিনি দিনের বেলায় খুতবা ও ফতোয়া প্রদানে ব্যস্ত থাকতেন। নিষিদ্ধ পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন।

তিনি ছিলেন অভাবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাঁর ছাত্রজীবনে বাগদাদে অনটন দেখা দেয়। তিনি তার নিকট থাকা স্বর্ণমুদ্রা থেকে অভাবীদেরকে দান করতেন এবং নিজে খেয়ে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করতেন। অসহায়দের প্রতি তাঁর দরদ কেমন ছিল, তা তাঁর কথা থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন, “আকসোস তোমার নিকট পুরোদিনের খাবার মওজুদ আছে। অথচ তোমার নিকটতম প্রতিবেশী উপবাস থাকছে। তোমার ইমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তুমি নিজের জন্য যা চাও অন্যের জন্য তা না চাও।”

এ মহান গুণি বড়লীর নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ৯০ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরি সনের ১১ রবিউস সানি তারিখে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাজার বাগদানে অবস্থিত। আমরা বড়লীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ব, সদা সর্বদা সত্য কথা বলব, অভাবী ও দুস্থদের সাহায্য ও সেবা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর চরিত্রের মহৎ গুণাবলির একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৭ আখিরাতে (الْآخِرَةُ)

আখিরাতে অর্থ পরকাল। মানুষের দুনিয়ার জীবনকে বলা হয় ইহকাল। আর ইহকালের পরের জীবনই হলো পরকাল। আরবিতে একে বলা হয় আখিরাতে। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলা হয় আখিরাতে। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আখিরাতে মানুষ জাহান্নামের শাস্তি বা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে।

আখিরাতে বিশ্বাসের গুরুত্ব

তাওহিদ ও রিসালাতে বিশ্বাসের পরপরই আমাদেরকে আখিরাতে বিশ্বাস করতে হবে। আখিরাতে বিশ্বাস না করলে কেউ মুমিন হতে পারবে না। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে চরিত্রবান ও সৎকর্মশীল করে তোলে। কেননা যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে, সে জানে আখিরাতে মানুষকে দুনিয়ার কাজের প্রতিদান দেওয়া হবে। সেখানে দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে সে পুরস্কার লাভ করবে। তার স্থান হবে চিরশান্তির জাহান্নাম। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে পাপ ও অন্যায় কাজ করবে সে আখিরাতে শাস্তি ভোগ করবে। সে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস করলে মানুষ ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়, মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকে। এভাবে আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালনা করে।

বলা হয়ে থাকে, “দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র”। শস্যক্ষেত্র মানুষ যেকোন চাষাবাদ করে সেরূপ ফসল লাভ করে। যেমন কেউ ধান চাষ করলে ধান লাভ করে। গম চাষ করলে গম লাভ করে। তেমনি ভালো করে চাষাবাদ করলে ফসল বেশি লাভ করে। আর অলসতার কারণে চাষাবাদ না করে জমি ফেলে রাখলে সে কিছুই লাভ করে না। দুনিয়া ও আখিরাতের অবস্থাও ঠিক তেমন। আমরা যদি দুনিয়াতে ভালো কাজ করি, আল্লাহ তা’আলার আদেশ নিষেধ মেনে চলি তাহলে আখিরাতে ভালো ফল লাভ করব। আর যদি নিজ ইচ্ছামত চলার ফেরা করি, অন্যায় ও পাপ কাজ করি তাহলে আমরা পরকালে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হব। সুতরাং পরকালের অনন্ত জীবনের জন্য দুনিয়াতেই আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

আখিরাতের পর্যায়সমূহ

আখিরাতে বা পরকালের বেশ কয়েকটি পর্যায় রয়েছে। যেমন: কবর, কিয়ামত ও হাশর।

কবর

পরকালীন জীবনের প্রথম ধাপ বা পর্যায় হলো কবর। একে ‘আলমে বারযাখ’ও বলা হয়। মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে এ জীবনের শুরু হয়। এরপর কিয়ামত বা হাশর পর্যন্ত কবরের জীবন চলতে থাকে।

মৃত্যুর পর মানুষকে কান্দন পরিবেশে কবরে রাখা হয়। এ সময় কবরে দু’জন ফেরেশতা আগমন করেন। তাদের নাম মুনকার-নাকির। তারা মৃত ব্যক্তিকে তিনটি প্রশ্ন করেন। এগুলো হলো- তোমার রব কে? তোমার দীন কী? এবং তোমার নবি কে? যেসব সোকের কবর দেওয়া হয় না তারাও এ প্রশ্ন থেকে রেহাই পায় না।

দুনিয়ার জীবনে যারা আল্লাহ তা’আলাকে বিশ্বাস করে এবং রাসুলের নির্দেশ মেনে চলে তারা এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে পারবে। তাদের কবর হবে শান্তিময়। আর যারা দুনিয়াতে ইমান আনেনি, দীন মেনে চলেনি তারা এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। তারা সেসময় শুধু আফসোস করবে। কবরের জীবন তাদের জন্য হবে অতি কষ্টনায়ক।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. হযরত মুহাম্মদ (স.) খ্রিস্টাব্দে জন্মলাভ করেন।
২. পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন.....।
৩. হযরত উমর (রা.) খ্রিস্টাব্দে খলিফা নির্বাচিত হন।
৪. হযরত বাদিআ (রা.)-এর উপাধি ছিল।
৫. অল্প বয়সেই পবিত্র কুরআনের হাফিয হন।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নারীদের কোনো সামাজিক	শান্তির কথা ভাবতেন।
২. মনিবরা ক্রীতদাসদের প্রতি অমানুষিক	নির্যাতন চালাত।
৩. হযরত মুহাম্মদ (স.) সকল জীব-জন্তুর	অধিকার ছিল না।
৪. জাতি একটি ভয়াবহ দুচ্ছ হতে	বৈধে গেল।
৫. হযরত মুহাম্মদ (স.) শৈশবকাল হতেই মানুষের	উপকারী বন্ধু ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আদর্শ জীবন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কী?
২. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মলগ্নে আরবের সামাজিক অবস্থার সংক্ষেপে বর্ণনা দাও।
৩. হযরত আবু বকর (রা.)-এর সভ্যবাদিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)-এর ভূমিকা কী ছিল? বর্ণনা কর।
২. ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর ভূমিকা আলোচনা কর।
৩. 'ফিকহশাফে' হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর অবদান আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (র.) কত হিজরি সনে অনুগ্রহণ করেন?

ক. ৪৬০

খ. ৪৭০

গ. ৪৮০

ঘ. ৪৯০

২. ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর জন্মস্থান কোথায় ?

- ক. বসরায়
- খ. দামেস্কে
- গ. কুফায়
- ঘ. বাগদাদে

৩. 'কুতুবে হানফিয়া'-

- i. সহজ সরল ফিক্‌হ
- ii. ইমাম মুফার (র.) সম্পাদনা করেন
- iii. তিরিশি হাজার মাসআলা সংবলিত ফিক্‌হ

কোনটি সঠিক-

- ক. i
- খ. ii
- গ. i, ii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সিরাজ সাহেব তার দুই ছেলের বিকল্পে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি তাকে কঠিন শাস্তি দেন।

৪. সিরাজ সাহেবের কাজের মাধ্যমে কোন সাহাবির আদর্শ ফুটে উঠেছে ?

- ক. হযরত আবুবকর (রা)
- খ. হযরত উমর (রা)
- গ. হযরত ওসমান (রা)
- ঘ. হযরত আলী (রা)

৫. সিরাজ সাহেবের আখলাকে হামিদার কোন গুণটি প্রকাশ পেয়েছে ?

- ক. ন্যায়পরায়ণতা
- খ. কর্তব্যপরায়ণতা
- গ. সততা
- ঘ. নিয়মানুবর্তিতা।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬, ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রূপগঞ্জ গ্রামে প্রভাব বিস্তার নিয়ে জসিম ও সিরাজ প্রপের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকে। এক পর্যায়ে খালেদ নামক এক তরুণ প্রবৃত্ত হয়। এ দৃশ্য দেখে শান্তিপ্রিয় তরুণ কামালের মাঝে চিন্তার উদ্বেগ হয়। সে এলাকায় শান্তি-স্বল্পতা প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু তরুণকে সঙ্গে নিয়ে 'বিজয়' নামক একটি সংঘে প্রতিষ্ঠা করে।

৬. নিচের কোনটির সঙ্গে কামালের সংঘের মিল রয়েছে ?

- ক. মজা বিজয়
- খ. মদিনা সনদ
- গ. হোদায়বিয়ার সন্ধি
- ঘ. হিলফুল ফুজুল।

৭. কামালের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে মূলত -

ক. উন্নয়ন আসবে

খ. শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে

গ. বিজয় অর্জিত হবে

ঘ. স্বভ্রমের উদয় হবে।

৮. কামাল এলাকার মানুষের কাছ থেকে পাবে -

i. গ্রন্থসো

ii. সম্পদ

iii. গ্রন্থযোগ্যতা।

কোনটি সঠিক -

ক. i, ii

খ. i, iii

গ. ii, iii

ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সাঈদ সাহেব একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি পবিত্র কুরআনের শিক্ষা প্রসারে এলাকায় একটি মন্ডব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এলাকার গরিব-দুঃখীদের অবস্থা চিন্তা করে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তার স্ত্রী আফরোজা স্বামীর কাজকর্মে হুঁদ হয়ে নিজের ব্যক্তিগত সমস্ত সম্পদ আত্মাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করে দেন।

ক. ইমাম আবু হানিফার পিতার নাম কী ?

খ. হযরত উমর (রা.)-কে ফারুক বলা হয় কেন ?

গ. পাঠ্য বইয়ে আলোচিত কোন মনীষীর আদর্শের সাথে সাঈদ সাহেবের কাজের মিল রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আফরোজার কার্যক্রম তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. জনাব আবু জাফর চৌধুরী ও জনাব আবুল কাসেম চৌধুরী পাশাপাশি দুই ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। জনাব আবু জাফর চৌধুরী গভীর রাতে বের হয়ে জনসাধারণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন। অপরপক্ষে জনাব আবুল কাসেম চৌধুরী দিনের কাজে তাঁর অর্জিত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিতেন।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দাদার নাম কী ?

খ. মহানবি (স.)-কে কেন 'আল-আমিন' বলা হয় ?

গ. জনাব আবু জাফর চৌধুরীর কাজটি ইসলামের কোন খলিফার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জনাব আবুল কাসেম চৌধুরীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি আদর্শ জীবন চরিত্রের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

কিয়ামত

কিয়ামত অর্থ মহাপ্রলয়। পৃথিবীতে এমন একসময় আসবে যখন মানুষ আত্মাহুতা তাল্লাকে ভুলে যাবে। দুনিয়াতে আত্মাহুতা বলার মতো কোনো লোক থাকবে না। সেসময় আত্মাহুতা পাক দুনিয়া ধ্বংস করে দেবেন। তাঁর নির্দেশে হযরত ইসরাফিল (আ.) শিলায় ফুক দেবেন। ফলে মহাপ্রলয় ঘটবে। এ দুনিয়ার যা কিছু আছে সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পাহাড়-পর্বত তুলার ন্যায় আকাশে উড়তে থাকবে। পৃথিবীর নিচের সমুদয় ধন-সম্পদ বের হয়ে আসবে। সবকিছু উলট-পালট হয়ে যাবে। কোনো প্রাণী বা বস্তু অবশিষ্ট থাকবে না। কেবল আত্মাহুতা তাল্লা থাকবে। তিনি ব্যতীত আর কেউ বিরাজমান থাকবে না। এ অবস্থাকেই বলা হয় কিয়ামত বা মহাপ্রলয়।

হাশর

হাশর শব্দের অর্থ- সমাবেশ, ভিড়, চাপ ইত্যাদি। কিয়ামতের পর বহুকাল একমাত্র আত্মাহুতা পাক বিন্যমান থাকবেন। অতঃপর তিনি পুনরায় সমস্ত প্রাণীকে জীবিত করবেন। তাঁর হুকুমে হযরত ইসরাফিল (আ.) খিটীয়বার শিলায় ফুক দেবেন। ফলে সকল প্রাণী পুনরায় জীবিত হবে। একে বলা হয় হুত্বার পর পুনরুত্থান। এ সময় একজন ফেরেশতা সবাইকে আহবান করবেন। ফলে সকলে একটি বিশাল ময়দানে সমবেত হবে। একে বলা হয় হাশর। আত্মাহুতা তাল্লা এখানে সকলের পাপপুণ্যের হিসাব নেবেন। সকল মানুষকে সে সময় আত্মাহুতা তাল্লার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন সূর্য মাথার অতি নিকটে থাকবে। প্রচণ্ড গরমে মানুষ ঘামতে থাকবে। এমনকি অনেক ঘামের মধ্যে সাতার কাটবে। আত্মাহুতা রবুল আলামিনের আরশের ছায়া ব্যতীত সেদিন অন্যকোনো ছায়া তথা আশ্রয়স্থল থাকবে না। ইমানদার পুণ্যবানগণ সেদিন আরশের ছায়াতলে স্থান লাভ করবেন। তাদের ডানহাতে আমলনামা দেওয়া হবে। আমলনামায় দুনিয়ার জীবনের সকল পাপ-পুণ্যের হিসাব লেখা থাকবে। পাপীরা বাম হাতে আমলনামা পাবে। এরপর আত্মাহুতা পাক মহাবিচার শুরু করবেন। এটিই হলো শেষ বিচারের দিন। এদিন মহান আত্মাহুতা হবেন একমাত্র বিচারক। নবি-রাসূল ও ফেরেশতাপণ এদিন সাক্ষী হবেন। মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এদিন সাক্ষ্য দান করবে। আমাদের সিয়রবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এদিন তাঁর উম্মতদের জন্য সুপারিশ (শাফা'আত) করবেন।

হাশরের ময়দানে মানুষের পাপপুণ্যের গুজন করা হবে। এটি সম্পন্ন হবে মিয়ান এর মাধ্যমে। মিয়ান হলো পরিমাপক যন্ত্র। যাদের পুণ্যের পাত্রা ভারী হবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তাঁরা জান্নাতের নানা রকম নিয়ামত ভোগ করবেন। সেখানে তারা যা চাইবে তাই পাবে। যাদের মিয়ানে পাপের পাত্রা ভারী হবে তারা হবে জাহান্নামী। জাহান্নাম হলো ভীষণ কষ্টের স্থান। সেখানে তারা আতনে দগ্ধ হবে। তবে কখনো মারা যাবে না। বরং কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।

হুত্বার পরবর্তী অনন্ত জীবনই হলো আখিরাত। সেখানে মানুষের পাপ-পুণ্যের হিসাব নেওয়া হবে। পুণ্যবানগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর পাপীরা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। সুতরাং আমরা দুনিয়াতে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। আত্মাহুতা তাল্লার আদেশ নিষেধ মেনে চলব। ন্যায় ও সবকাজ করব। তবেই পরকালে চিরশান্তির জান্নাত লাভ করতে পারব।

কাঙ্ক্ষা : শিক্ষার্থীরা আখিরাতের গুরুত্বমূহের একটি ধারাবাহিক তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮ আকাইদ ও নৈতিকতা

ইসলামের মূল বিষয়সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার নামই আকাইদ। যেমন: তাওহিদ, রিসালাত, আখিরাত ইত্যাদি। আর নৈতিকতা হলো নীতির অনুশীলন। অর্থাৎ কথা ও কাজে উত্তম নীতি-নীতির অনুশীলন করা, মার্জিত ও বিনয়ী হওয়া, উত্তম চরিত্রবান হওয়া ইত্যাদি। অন্যায়, অশ্লীল ও অশালীন বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করাও নৈতিকতার অন্তর্ভুক্ত।

নৈতিকতা ও নীতির অনুসরণ মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। নীতিহীন মানুষ পতর সমান। পতর কোনোরূপ নীতিবোধ নেই। সে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ কোনো কিছুই সে পরোয়া করে না। সে শুধু নিজের লাভ ও কল্যাণই বোঝে। নীতিহীন মানুষও ঠিক তেমনি। সে কোনোরূপ আইন-কানুন, বিধি-বিধান মানে না। সে নৈতিক আচরণ পালন করে না। বরং নিজের লাভের জন্য সে অপরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। মিথ্যা, প্রতারণা, ঘোঁরা সেওয়া, পরচর্চা ইত্যাদি তার চরিত্রে ফুটে ওঠে। সমাজে সে নানারূপ অশান্তি সৃষ্টি করে। ফলে সমাজের কেউই তাকে বিশ্বাস করে না। কোনো মানুষই তাকে ভালোবাসে না।

অন্যদিকে নৈতিকতা মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে। নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ সমাজে শ্রদ্ধা ভালোবাসা লাভ করে। সকলেই তাকে সন্মান করে।

আকাইদ ও নৈতিকতার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। আকাইদ বা ইসলামি বিশ্বাসসমূহ মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। যে ব্যক্তি আকাইদের বিষয়গুলো ভালোভাবে বিশ্বাস করে তার চরিত্র সুন্দর হয়। সে সবসময় নীতি ও উত্তম আদর্শের অনুসরণ করে। অন্যায়-অত্যাচার, অশ্লীলতা থেকে সে সর্বদা দূরে থাকে। সে কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয় না। বরং সমাজ থেকে দুর্নীতি প্রতিরোধে সে সচেষ্ট হয়।

আকাইদের প্রথম বিষয় হলো তাওহিদ। তাওহিদ হলো একত্ববাদ। আল্লাহ তা'য়ালাকে এক ও অধিতীয় বলে বিশ্বাস করা। তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী ইত্যাদি বিশ্বাস করা। তাওহিদে এরূপ বিশ্বাসী ব্যক্তি কখনো ঐনৈতিক কাজ করতে পারে না। কেননা সে জানে যে তার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রবুল আলামিন। তিনি তাকে সর্বদা দেখছেন এবং তার সকল কাজের হিসাব রাখছেন। সুতরাং সে সর্বদা আল্লাহ তা'য়ালার হুকুমমত জীবনযাপন করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে।

তাওহিদের পরই আসে রিসালাত। রিসালাত হলো নবি-রাসুলগণের উপর বিশ্বাস। তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার মনোনীত বান্দা। তাঁরা ছিলেন মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠজন। তাঁরা নিষ্পাপ ও উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। সুতরাং রিসালাতে বিশ্বাসী মানুষ নবি-রাসুলগণের চরিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাঁদের ন্যায় সেও উত্তম চরিত্র অনুশীলন করে। উদ্ধত ও অশালীন চলাফেরা ও কথাবার্তা তার থেকে কখনো প্রকাশ পায় না।

আখিরাতে বিশ্বাস আকাইদের অন্যতম অংশ। আখিরাত হলো পরকাল। মানুষের এ দুনিয়ার জীবনই শেষ নয়। বরং মৃত্যুর সাথে সাথে আরেক জীবনের শুরু হবে। এরই নাম আখিরাত। এ জীবনের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এ জীবন অনন্ত ও চিরস্থায়ী। আখিরাতে মানুষের দুনিয়ার কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। দুনিয়াতে যে ভালো ও নেক কাজ করবে আখিরাতে সে চিরশান্তির জন্মলাভ লাভ করবে। আর দুনিয়ায় যে অন্যায় ও পাপ কাজ করবে আখিরাতে সে চরম শাস্তির মুখোমুখি হবে, তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। সুতরাং আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করতে

উৎসাহিত করে। আখিরাতের সফলতা ও শান্তির আশায় মানুষ ভালো কাজ করে, সকলের সাথে মিলেমিশে চলে এবং উত্তম চরিত্রবান হয়। অন্যদিকে আখিরাতের শাস্তির ভয়ে মানুষ মন্দ ও অশ্রীল কাজ পরিত্যাগ করে। অন্যায়, অত্যাচার ও পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। এভাবে মানুষ আখিরাতে বিশ্বাসের ফলে নৈতিকতা অনুশীলন করে থাকে।

অতএব নৈতিকতা অর্জনে আকাইসের জুম্বিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভালোভাবে তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাস করব। দুনিয়াতে নৈতিকতার অনুশীলন করব, নৈতিক কাজকে কখনোই পছন্দ করব না। তাহলে আমরা ইহকাল ও পরকালে সফলতা লাভ করব।

কাজ : শ্রেণির সব শিক্ষার্থী মিলে তাদের মধ্য থেকে দুইজন ছাত্র দুইজন ছাত্রীকে নির্বাচন করবে। তারা প্রত্যেকে এই পাঠ থেকে কী শিক্ষা পেলো তা আলোচনা করবে আর অন্য সব শিক্ষার্থী শুনবে।

নতুন শব্দাবলি

ইলাহ - মানুষ, উপাস্য

মাবুদ - ইবাদতের যোগ্য/অধিকারী। যার ইবাদত করা হয়

লা-শরিক - যার কোনো অংশীদার নেই

দীন - ধর্ম, জীবন বিধান

আরশ - আল্লাহ তা'আলার আসন

উম্মত - অনুসারী বা দল। যেমন- আমরা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মত; দল

দাওয়াত - আহ্বান। আল্লাহ তা'আলা ও দীন ইসলামের দিকে আহ্বানকে দাওয়াত বলা হয়।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. কালিমা তায়িবা অর্থ হলো ।
২. কালিমা শাহাদাত ইমানের অন্যতম বাক্য ।
৩. ইমান মুজমাল অর্থ সৎকিঞ্চ ।
৪. আত্মাহ তা'য়াল্লা সকল স্তরের ।
৫. ইসলামি আকিদায় তাওহিদের পরই স্থান ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. কালিমা তায়িবা	বলা হয় রাসূল
২. আত্মাহর গুণবাচক নাম আত্মাহর	নবি-রাসূল পাঠিয়েছেন
৩. রিসালাতের দায়িত্ব পালনকারীকে	ইমানের মূল ভিত্তি
৪. আত্মাহ তা'য়াল্লা পৃথিবীতে অনেক	শ্রেষ্ঠ সন্তান
৫. নবি-রাসূলগণ ছিলেন মানবজাতির	পরিচয় প্রকাশ করে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইমানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।
২. আত্মাহর গুণবাচক নাম 'কারিমুন' এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখ ।
৩. হাশর বলতে কী বুঝ ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. রিসালাতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর ।
২. 'আখিরাতে বিশ্বাস নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটায়' – ব্যাখ্যা কর ।
৩. নৈতিকতা উন্নয়নে আকাইদের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'আকিদাহ' (الْعَقِيدَةُ) শব্দের অর্থ কী ?

- ক. একত্ববাদ খ. বিশ্বাসমালা
গ. বিশ্বাস ঘ. পবিত্র

২. নৈতিকতা বলতে বোঝায় -

- i. কর্মে উত্তম রীতি-নীতির অনুশীলন করা
ii. পড়ালেখায় মনোযোগী হওয়া
iii. খারাপ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i, ii
খ. i, iii
গ. ii, iii
ঘ. i, ii, iii

৩. কালিমা তায়্যিবা অর্থ কী ?

- ক) পুণ্যবাক্য
খ) পূর্ববাক্য
গ) পবিত্র বাক্য
ঘ) পরিচ্ছন্ন বাক্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪, ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

আরিক ও জিয়াদ একই বিদ্যালয়ে পড়ে। আরিক বলল, মানুষের সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য নবি-রাসুলের প্রয়োজন নাই। জিয়াদ বলল, নবি-রাসুলগণই আমাদেরকে আদ্বাহ ও রাসুলের পরিচয় জানিয়েছেন।

৪. আরিকের মধ্যে কোন বিশ্বাসের অভাব রয়েছে ?

- ক) আখিরাতের
খ) হাশরের
গ) হিসাবাতের
ঘ) মিথানের।

৫. আরিফের বক্তব্যে তার কী নষ্ট হবে ?

- ক) আমল
- খ) ইমান
- গ) সুনাম
- ঘ) প্রভাব।

৬. জিয়াদের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে, সে একজন -

- i. মুমিন
- ii. মুসলিম
- iii. আবেদ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i, ii
- খ. ii
- গ. i, ii
- ঘ. ii, iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মুরিদ কর ফাঁকি নিয়ে বিদেশি শাড়ি আমদানির মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তার ছোট ভাই নাজির সরকারি অফিসে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করেন। অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের অনেক পথ খোলা থাকলেও তিনি তা কখনো গ্রহণ করেন নি। তিনি মনে করেন দুনিয়ার সুখশান্তি ক্ষণস্থায়ী।

- ক) কিয়ামত শব্দের অর্থ কী ?
- খ) 'হাশর' বলতে কী বোঝায় ?
- গ) মুরিসের কর্মকাণ্ডে কোন বিশ্বাসের অভাব রয়েছে ? ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ) নাজির সাহেবের কর্মকাণ্ড ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন কর।

২। রাশেদ ও খালেদ সহপাঠী। হেফজের শেষে তারা কল্পবাজার ও সুন্দরবন ভ্রমণে গিয়েছিল। সেখানকার পাহাড়-পর্বত, কর্ণাধারা, গাছপাছালি ও সমুদ্র তীরের মনোরম দৃশ্যাবলি দেখে মুগ্ধ হয়ে রাশেদ বললো, কী চমৎকার মহান আল্লাহর সৃষ্টি! কিন্তু খালেদ ভিমত পোষণ করে বললো, এসব কিছু প্রকৃতির সৃষ্টি। এসবের মাঝে সৃষ্টিকর্তার অবদান আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না।

- ক) কালিমা তায়্যাবার কয়টি অংশ?
- খ) ভাওহিদে বিশ্বাস প্রয়োজন কেন ?
- গ) রাশেদের মন্তব্যে কী প্রকাশ পেয়েছে ?
- ঘ) খালেদের মতামতের পরিণাম পাঠ্যবইয়ের আলোকে মূল্যায়ন কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় ইবাদত (الْعِبَادَةُ)

আল্লাহ তা'য়ালার দাসত্ব স্বীকার করাকে ইবাদত বলে। আল্লাহর সকল আদেশ নিষেধ, বিধি-বিধান মেনে চলার নামই ইবাদত। পরকালের শান্তির জন্য মানুষ সালাত, সাওম ইত্যাদি পালন করে থাকে। দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইবাদতের ধারণা, তাৎপর্য ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব।
- পবিত্রতা ও অপবিত্রতার ধারণা ও পবিত্র থাকার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- পবিত্র হওয়ার উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- সালাত (নামায) আদায়ের নিয়ম-কানুন, সময়সূচি ও সালাতের ফরয, ওয়াজিব ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।
- সালাত (নামায) ভঙ্গের কারণ বর্ণনা করতে পারব।
- সিজদাহ সাহ ও সিজদাহ তিলাওয়াতের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্যের শিক্ষা অর্জনে সালাতের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

ইবাদতের ধারণা ও তাৎপর্য

ইবাদত আরবি শব্দ। এর অর্থ দাসত্ব বা আনুগত্য। আদ্রাহর দাসত্ব ও আনুগত্যই হল ইবাদত। ইসলামি পরিভাষায় আদ্রাহর সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই ইবাদত।

মহান আদ্রাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আমাদের লালন পালন করেন। তিনিই আমাদের রব। আমরা তাঁর বান্দা। আমাদের জীবন, মরণ তাঁর হাতে। তিনি আমাদের জন্যে এ মহাবিশ্বকে কত সুন্দর করে সাজিয়েছেন। আসমান জমিন, চাঁদ-সূর্য, ফল-ফুল, নদী-মালা সব আমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আমরা সব ভোগ করি। আমাদের সৃষ্টির সেবা জীব হিসেবে তৈরি করেছেন। আদ্রাহর সেওয়া অকুর্ত নিয়ামত ভোগ করার পর এর শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে হবে। নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করে আদ্রাহর সেওয়া বিধানমতো চলার নামই ইবাদত। আমরা আদ্রাহর আদেশমতো চলব এবং তাঁরই ইবাদত করব। পবিত্র কুরআনে আদ্রাহ তা'য়ালা বলেন :

“এবং তুমি তোমার ঈর্ষির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংসে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।” (সূরা আল-মুমিন : ৫৫)

মহান আদ্রাহ সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত বা দাসত্ব স্বীকার করার জন্য। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে আদ্রাহ তা'য়ালা ঘোষণা করেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থ : “আর আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬)

মহানবি (স.) ইবাদত সম্পর্কে বলেছেন : “যেখানেই থাক আদ্রাহকে ভয় করে চল। আর কখনো কোনো মন্দ কাজ হয়ে গেলে তখন একটি ভালো কাজ করে ফেল। তাহলে এ কাজটি পূর্ববর্তী মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে। আর মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর।” (তিরমিযি)

যেখানে আদ্রাহ তা'য়ালা তাঁর বড় বড় দানের কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই তিনি রাসুলুল্লাহ (স.)-কে ‘আবদুল’ বলে সম্বোধন করেছেন। যেমন : কুরআন মজিদ অবতীর্ণের সময় আদ্রাহ তা'য়ালা বলেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

অর্থ : “সকল প্রশংসা আদ্রাহর জন্যে যিনি তাঁর বান্দার (রাসুলের) উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন” (সূরা আল-কাহুফ : ১১)

আমরা ভালো কাজ করব। অন্যকে সবকাজের পরামর্শ দেব। এতে উভয়ই সমান সাওয়াব পাবে। এ গ্রন্থে মহানবি (স.) বলেন : “যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজের পরামর্শ বা সন্ধান দেবে, সে ঐ কাজটি সম্পাদনকারীর সমান সাওয়াব পাবে (মুসলিম)।” আমাদের জন্যে নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি কতগুলো নির্ধারিত ইবাদত রয়েছে। এগুলো নবি করিম (স.) যেভাবে আদায় করেছেন, আমাদেরকে করতে বলেছেন, আমরা ঠিক সেভাবেই আদায় করব। এভাবে মানুষ তার জীবনকে পরিচালিত করলে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ও অপরের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি বৃদ্ধি পাবে।

ইবাদতের প্রকারভেদ

ইবাদতকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় : ১. ইবাদতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদত ২. ইবাদতে মালি বা আর্থিক ইবাদত ৩. ইবাদতে মালি ও বাদানি বা শরীর ও অর্থ উভয়ের সম্মিশ্রণে ইবাদত। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যে ইবাদত করা হয় তাকে বলা হয় ইবাদতে বাদানি বা শারীরিক ইবাদত। যথা : সৈনিক পাঁচ ওয়াস্ত নামায আদায় করা ও রমযান মাসে রোযা রাখা। ইবাদতের মধ্যে শারীরিক ইবাদত সবচেয়ে বেশি পুরুষপূর্ণ। অর্থের দ্বারা যে ইবাদত করতে হয় সেগুলোকে বলা হয় ইবাদতে মালি বা আর্থিক ইবাদত। যেমন : যাকাত দেওয়া, সাদকা ও দান-খয়রাত করা ইত্যাদি। উদ্ভিখিত দুই প্রকার ইবাদত ছাড়াও এমন কিছু ইবাদত আছে যা শুধু শরীর দ্বারা কিংবা অর্থ দ্বারা করা যায় না। বরং শরীর এবং অর্থ উভয়ের প্রয়োজন হয় যেমন : হজ্জ করা, জিহাদ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ তা'আলা যেহেতু আমাদের ইবাদতের জন্যেই সৃষ্টি করেছেন, তাই সবসময় তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকা আমাদের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সবসময় কি ইবাদত করা সম্ভব? হ্যাঁ, দিনরাত চকিৎ ঘণ্টা ইবাদত করা সম্ভব। যেমন আমরা খেতে বসলে যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করি, তবে যতক্ষণ খাওয়ার মধ্যে থাকব ততক্ষণ আল্লাহর রহমত পেতে থাকব। এটিই ইবাদত। পড়ার সময় যদি 'বিসমিল্লাহ' বলে পড়া শুরু করি তবে যতক্ষণ পর্যন্ত লেখাপড়া করব, ততক্ষণই তা ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। স্কুলে যাবার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যাত্রা শুরু করলে রাস্তার সকল বিপদাপদ থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। একজন অশ্বলোক রাস্তা পার হতে পারছে না, তাকে হাত ধরে রাস্তা পার করে দিলে তাও আল্লাহর নিকট ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে। এমনভাবে সবসময় আমরা ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি। ইবাদত করলে আল্লাহ খুশি হন। এতে দুনিয়ার জীবন সুখময় হয়। পরকালে পরম শান্তিময় স্থান জন্মাত লাভ করা যায়। আর যারা ইবাদত করে না, আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলে না, আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হন। তারা দুনিয়াতে শান্তি পায় না। পরকালেও তাদেরকে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার বাইরে আর কোন কোন কাজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার তালিকা তৈরি কর।

পাঠ ২ অপবিত্রতা (النجاسة)

অপবিত্রতার আরবি প্রতি শব্দ 'নাজাসাতুন'। এটি হলো তাহারাভূন (পবিত্রতা) এর বিপরীত। কতিপয় বস্তুর কারণে বা প্রভাবে পবিত্র জিনিস অপবিত্র হয়ে যায়, একে নাজাসাত বলে। যেমন: পেশাব, পায়খানা ইত্যাদির কারণে শরীর, কাপড় ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র অপবিত্র হয়ে যায়। এ অবস্থায় তা পবিত্র করা একান্ত জরুরি।

অপবিত্র অবস্থা থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য আত্মাহ তাহালা নির্দেশ রয়েছে। আত্মাহ তাহালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন:

“এবং আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন।” (সূরা আল-মুদ্দাসসির: ৪)

নাজাসাত বা অপবিত্রতা দুই প্রকার:

১. নাজাসাতে হাকিকি বা প্রকৃত অপবিত্রতা ২. নাজাসাতে হুকমি বা অপ্রকৃত অপবিত্রতা।

নাজাসাতে হাকিকি

নাজাসাতে হাকিকি হচ্ছে ঐ সকল অপবিত্র বস্তু যা থেকে মানুষ নিজে দূরে থাকতে চায় এবং নিজের শরীর, পোশাক পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ব্যবহারের জিনিসপত্র বাঁচিয়ে রাখতে চায়। যেমন: পেশাব, পায়খানা, রক্ত, মদ ইত্যাদি। ইসলাম এসব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

নাজাসাতে হুকমি

নাজাসাতে হুকমি হচ্ছে ঐসকল অপবিত্রতা যা দেখা যায় না কিন্তু ইসলামি বিধানে তা নাজাসাত বা অপবিত্র বলে গণ্য। যেমন: গল্প ভঙ্গ হওয়া, শোসলের প্রয়োজন হওয়া ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, উভয় প্রকার অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র রাখা একান্ত প্রয়োজন।

অপবিত্রতার ব্যাপারে সতর্ক না থাকলে কবরের শান্তি ভোগ করতে হবে। মহানবি(স.) একদিন দু'টি কবরের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, এ “কবর দু'টিতে যাদের দাফন করা হয়েছে, তাদের ওপর শান্তি হচ্ছে। তাদের একজনের গুনাহ তো এই যে, সে পেশাবের অপবিত্রতা হতে পবিত্র থাকার চেষ্টা করত না। আর অপরজন চোগলখোরি (দুর্নীতি) করে বেড়াতে। তারপর মহানবি(স.) বেজুরের একটি কাঁচা ডাল ভেঙে দু'টুকরা করে দু'কবরে পুতে দিলেন। সাহাবিগণ (রা.) নিবেদন করলেন, হে আত্মাহ তাহালা! কী উদ্দেশ্যে আপনি এ কাজ করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, আশা করা যায় ডালের এ টুকরো শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত উভয়ের কবর আযাব (শাস্তি) কম করে দেওয়া হবে”। (খুবারি ও মুসলিম)

কাজ : শিক্ষার্থীরা চার-পাঁচজনের দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দল প্রকৃত অপবিত্রতার ও অপ্রকৃত অপবিত্রতার একটি তালিকা ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৩ পবিত্রতা (الطَّهَارَةُ)

পবিত্রতার আরবি প্রতিশব্দ ‘তাহারাতুন’। ওয়ু, গোসল, ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়। ইবাদতের জন্য পবিত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন। পবিত্র না হয়ে নামায আদায় করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স) বলেন: “পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না এবং আত্মশাতের মাল সাদাকা (দান) হয় না।” (মুসলিম)।

পবিত্র থাকলে শরীর সুস্থ থাকে। মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া ও কাজকর্মে মন বসে। আল্লাহ তা‘আলাও পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ

অর্থ: “আর উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদের আল্লাহ তা‘আলা ভালোবাসেন।” (সূরা আত্-তাওবা: ১০৮)

রাসুলুল্লাহ (স.) স্বয়ং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি তাঁর উখতকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন এবং পবিত্র থাকার জন্যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, “পবিত্রতা ইমানের অংশ।” (মুসলিম)

পবিত্রতার প্রকারভেদ

পবিত্রতা দুই প্রকার: ১. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ২. বাহ্যিক পবিত্রতা

অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা:

হৃদয়কে যাবতীয় শিরক আকিদা, রিয়া, গিবত ইত্যাদি থেকে মুক্ত রাখার নাম অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা।

বাহ্যিক পবিত্রতা:

শরিয়তের বিধিমোতাবেক ওয়ু, গোসল ইত্যাদির মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনকে বাহ্যিক পবিত্রতা বলে।

পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মানদণ্ড হচ্ছে শরিয়ত। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি বা অভিকর্ষি অনুযায়ী এ বিষয়ে কিছু কম-বেশি করার কারো অধিকার নেই। কেবল সেসব বস্তুই পবিত্র যাকে শরিয়ত পবিত্র বলেছে। আর সেসব বস্তু অপবিত্র যাকে শরিয়ত অপবিত্র বলেছে। সুতরাং শরিয়তের বিধিমোতাবেক পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। নিজের ধ্যান-ধারণা ও ক্রটির বশীভূত হয়ে পবিত্রতা ও অপবিত্রতার কোনো মানদণ্ড ঠিক করা উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

অর্থ: “আল্লাহ তোমাদের উপর কোনো অসুবিধা রাখতে চান না। বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান।” (সূরা আল-মাদিলা: ৬)

কাজ: শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে পবিত্র থাকার উপায়গুলো দলীয় আলোচনার পর পোস্টারে লিপিবদ্ধ করবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৪ ওযু (الْوُضُوءُ)

ওযু আরবি শব্দ। এর অর্থ সুন্দর, পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় শরীর পবিত্র করার নিয়তে পবিত্র পানি দিয়ে শরিয়তের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধোয়ার নামাই ওযু।

ওযুর গুরুত্ব

ওযুর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

“যারা ইমান এনেছে জেনে রেখো, যখন তোমরা নামাযের জন্য দাঁড়াবে তার আগে নিজেদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নেবে, তোমাদের দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নিবে, মাথা মাসেহু করবে এবং উভয় পা গিরাসহ ধুয়ে নেবে।” (সূরা আল-মায়িদা: ৬)

ভালোভাবে ওযু করলে মন প্রফুল্ল থাকে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সতেজ থাকে। ইবাদতেও একান্তা আসে। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন: ‘আমি কিয়ামতের দিন আমার উম্মতকে চিনতে পারব।’ জনৈক সাহাবি প্রশ্ন করলেন: ‘হে আল্লাহর রাসূল কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি কীভাবে আমাদের চিনবেন?’ নবি করিম (স.) উত্তরে বললেন: ‘ওযুর ফলে আমার উম্মতের মুখমণ্ডল এবং হাত পা উজ্জ্বলতায় স্বক্বক্ব করবে। তাতেই আমি আমার উম্মতকে চিনতে পারব।’ (বুখারি ও মুসলিম)। কাজেই ওযুর ফযিলত বা মর্যাদা পাবার আশায় আমাদের অতি উত্তমরূপে ওযু করতে হবে। ওযু পরিপূর্ণ হলে ইমাম ও মুক্তাদি উভয়ের নামাযই পরিশুদ্ধ হয়। আর ওযু অপরিপূর্ণ হলে নামাযে পরিপূর্ণতা আসে না।

ওযুর নিয়ম

মনে মনে পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করে বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে তারপর ডান হাতে পানি দিয়ে তিনবার কুলি করতে হবে। রোযা না থাকলে তিনবারই গড়গড়া করে কুলি করতে হবে। এরপর নাকে পানি দিয়ে তিনবার নাক পরিষ্কার করতে হবে। তারপর তিনবার সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে হুল পরিমাণ স্থানও শুকনো না থাকে। মাড়ি ঘন হলে খিলাল করতে হবে। এরপর দুই হাত কনুই সহ ধৌত করতে হবে। হাতে ঘড়ি/আঁটি ইত্যাদি থাকলে তা নাড়্যাচাড়া করতে হবে যেন সবখানে পানি পৌঁছে যায়। তারপর দুই হাত ভিজিয়ে মাথা এবং কান মাসেহু করতে হবে। মাসেহু করার সময় দুই হাতের বুড়ো এবং শাহাদাত অঙ্গুলি আলাদা রেখে বাকি তিন অঙ্গুলি মিলিয়ে অঙ্গুলিগুলোর ভিতর দিক দিয়ে কপালের চুলের গোড়া থেকে পেছন দিকে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহু করতে হবে। তারপর দুই হাতের তালু পেছন দিক থেকে সামনের দিকে টেনে মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসেহু করতে হবে। এরপর শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে হাতের অঙ্গুলিগুলোর পিঠ দিয়ে ঘাড় মাসেহু করতে হবে। মাসেহু করার পর দুই টাখনু সহ ভালো করে ধৌত করতে হবে যাতে একটু জায়গাও বাকি না থাকে। ওযুর কাজগুলো পর পর করে যেতে হবে। অর্থাৎ এক অঙ্গের পর অন্য অঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ধৌত করতে হবে। অনেককণ থেকে থেকে করা যাবে না।

ওমুর ফরয

ওমুর ফরয চারটি । এ চারটির মধ্যে কোনো একটি বাদ পড়লে ওমু হবে না ।

১. মুখমন্ডল একবার ধৌত করা ।
২. উভয় হাত কনুই সহ একবার ধোয়া ।
৩. মাথার এক-চতুর্থাংশ একবার মাসেহু করা ।
৪. উভয় পা পিরাসহ একবার ধোয়া ।

ওমু ভঙ্গের কারণ

১. পেশাব পায়খানার রাজ্য দিয়ে কোনো কিছু বের হলে ।
২. পেশাব পায়খানার রাজ্য ব্যতীত শরীরের যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো অপবিত্র বস্তু বের হয়ে গড়িয়ে গেলে যেমন : রক্ত, পুঁজ ইত্যাদি ।
৩. খুশু, কাশি ব্যতীত বমির সাথে রক্ত, পুঁজ, খাদ্য অথবা অন্য কিছু বের হলে এবং মুখভর্তি বমি হলে ।
৪. খুশুর সাথে বেশি পরিমাণ রক্ত এলে ।
৫. চিত হয়ে, কাত হয়ে অথবা হেলান দিয়ে ঘুমালে ।
৬. বেহুশ হলে ।
৭. পাগল হলে ।
৮. নেশাগ্রস্ত হলে ।
৯. নামাযে অষ্টহাসি হাসলে

কাঙ্ক্ষ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় ওমু করার উপকরণের মাধ্যমে অথবা প্রতীকী উপকরণের সাহায্যে ওমু করার নিয়ম অনুশীলন করবে ।

পাঠ ৫ তায়াম্মুম (الْتَيْمُّمُ)

তায়াম্মুম আরবি শব্দ। এর অর্থ ইচ্ছে করা। ইসলামি পরিভাষায় পবিত্র মাটি বা ঐ জাতীয় পবিত্র বস্তু (যেমন : পাথর, চুনা, বাগি ইত্যাদি) দ্বারা পবিত্র হওয়ার নিয়তে মুখমন্ডল ও উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ্ করাকে তায়াম্মুম বলে। তায়াম্মুম শুধু ও গোসল উভয়ের পরিবর্তে করা যায়। তায়াম্মুমের মাধ্যমে পবিত্র হওয়ার অনুমতি উম্মতে মুহাম্মাদির (স.) জন্য আত্মাহ তাআলার এক বিশেষ অনুগ্রহ। বস্ত্রত পবিত্রতা অর্জনের প্রকৃত মাধ্যম হলো পানি। আত্মাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাসের জন্য প্রচুর পরিমাণে পানি সরবরাহ করে রেখেছেন। তথাপি এমন অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে, যে পানি পাওয়া যাচ্ছে না অথবা পাওয়া গেলেও পানি ব্যবহারে রোগবৃদ্ধি বা প্রাণনাশের আশংকা রয়েছে। এসব অবস্থায় আত্মাহ তা'য়ালা মাটি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনের অনুমতি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আত্মাহ তা'য়ালা বলেন: আর তোমরা যদি পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসেহ্ করবে। আত্মাহ তা'য়ালা তোমাদের কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। (সূরা আল-মায়িদা : ৬)

তায়াম্মুমের ফরয : তায়াম্মুমের ফরয তিনটি।

১. পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা।
২. পবিত্র মাটি দিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ্ করা।
৩. উভয় হাত পবিত্র মাটি দিয়ে কনুইসহ মাসেহ্ করা।

তায়াম্মুম করার নিয়ম

প্রথমে নিয়ত করে 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়বে। তারপর দু'হাতের তালু একটি প্রসারিত করে পবিত্র মাটি বা ঐ জাতীয় পবিত্র বস্তু যেমন : পাথর, চুনা, বাগি ইত্যাদিতে দুই হাত লাগিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল একবার মাসেহ্ করবে। পুনরায় দুই হাত মাটিতে লাগিয়ে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ্ করবে। হাতে কোনো ঘড়ি বা অন্য কোনো জিনিস থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ্ করতে হবে।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে শুধু ভঙ্গ হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। পানি পাওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়। কোনো রোগের কারণে তায়াম্মুম করা হলে, সে রোগ দূর হওয়ার সাথে সাথে তায়াম্মুম ভেঙ্গে যায়।

কাঙ্ক্ষ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই শ্রেণিতে শিক্ষকের নির্দেশনায় তায়াম্মুম করার পদ্ধতি অনুশীলন করবে।

পাঠ ৬ গোসল (الْغُسْلُ)

‘গোসল’ আরবি শব্দ। এর অর্থ ধৌত করা। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জন ও আত্মাহার সজ্জি লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র পানি দ্বারা সমস্ত শরীর ধোয়াকে গোসল বলে।

গোসলের ফরয : গোসলের ফরয তিনটি :

১. গড়গড়া করে কুলি করা।
২. নাকের নরম ভাঙ্গণা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো।
৩. সমস্ত শরীর পানি দিয়ে ধোয়া।

গোসলের নিয়ম

প্রথমে ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কজি পর্যন্ত ভালো করে ধৌত করতে হবে। তারপর শরীরের কোথাও অপবিত্র বস্তু লেগে থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। এরপর ভালোভাবে শুষ্ক করতে হবে। কুলি করার সময় কঠিনদেশে এবং নাকের ভিতরে পানি ভালো করে পৌঁছাতে হবে। শুষ্ক পর মাথায় পানি ঢালতে হবে। এরপর ডান কাঁধে তারপর বাম কাঁধে পানি ঢেলে সমস্ত শরীর ধৌত করতে হবে যেন শরীরের কোনো অংশ শুকনো না থাকে। সর্বশেষে পা ধুতে হবে। এরপর সমস্ত শরীর কোনো কাপড় বা গামছা দিয়ে মুছে শুকনো কাপড় পরতে হবে। মেরেদের জন্যে খোঁপা বা বেদী খোলার প্রয়োজন নেই, তবে চুলের গোড়ায় অবশ্যই পানি পৌঁছাতে হবে।

কাজ : ‘পবিত্র হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে গোসল।’

এ নিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে দলে ভাগ হয়ে বিতর্ক করবে।

পাঠ ৭ সালাত (الصَّلَاةُ)

‘সালাত’ আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ সোয়া, রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাদি। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আরকান আহকামসহ বিশেষ নিয়ম ও নির্দিষ্ট সময়ে আত্মাহর ইবাদতের নাম সালাত বা নামায। আত্মাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে নামায। ইসলামের পাঁচটি রুকন বা স্তম্ভের মধ্যে নামায দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ রুকন। হাসিমে আছে, “ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত: এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে আত্মাহ হ্যাঁ কোনো মা’বুন নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর (আত্মাহ তা’য়ালা) বান্দা ও রাসুল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ করা এবং রমযান মাসে রোযা রাখা।” (বুখারি, তিরমিযি)

পবিত্র কুরআন মজিদে আত্মাহ তা’য়ালা বলেন:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

অর্থ: “এবং তোমরা নামায কয়েম কর ও যাকাত আদায় কর।” (সূরা আল-বাকার: ৪৩)

নামায মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন আত্মাহ তা’য়ালা পবিত্র কুরআন মজিদে ঘোষণা করেন:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ: “নিশ্চয়ই নামায মানুষকে অশ্লীল ও ধারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।” (সূরা আন-আনকাবুত: ৪৫)

নামায আদায়কারী দুনিয়াতে মর্যাদা পাবে। আখিরাতে পাবে জাহান্নাত। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন, “নামায বেহেশতের চাবি।” কারও হাতে কোনো ঘরের চাবি থাকলে যেমন অতি সহজেই ঘরে প্রবেশ করতে পারে। তেমনি যে ব্যক্তি নামায কয়েম করে সে অতি সহজেই জাহান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। নামাযের মাধ্যমে হুমিনের স্তন্যাহ হাক হযা: রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: ‘এ কথার মধ্যে তোমাদের কী মত? যদি তোমাদের কারো বাড়ির দরজায় একটি প্রবাহিত নদী থাকে, যার মধ্যে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে। তা’হলে তার সেহে কোনো ময়লা বাকী থাকবে কী? সাহাবিপণ (রা.) বলেন: তার কোনো ময়লা বাকী থাকবে না। তখন রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন: এটাই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদাহরণ যা দ্বারা যাবতীয় গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হয়। (বুখারি ও মুসলিম)।

মহানবি (স.) আরও বলেন: “যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নূর, দলিল ও নাজাত হবে। আর যে ব্যক্তি নামাযের হেফাজত করবে না কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নূর, দলীল ও নাজাত হবে না। তার হাশপ হবে কাক্রপ, ক্ষেরাউন, হামান ও উবাই ইবনে খলফের সঙ্গে।” (আহমদ, দারেমি)

এছাড়াও নামাযের আরও কতিপয় গুরুত্ব রয়েছে যা সর্কিগ আকারে বর্ণিত হলো:

- ইসলামে ইমানের পরই নামাযের স্থান।
- যেজ্জায় নামায ত্যাগ করা কুফর।
- নামায দীন ইসলামের খুঁটি স্বরূপ।
- মুহূর্তকালে রাসুলুল্লাহ (স.)-এর সর্বশেষ উপদেশ ছিল নামায ও মাহীজাতি সম্পর্কে।

কাজ : “একজন মানুষ নামাযি হতে পরিবারই মুখ্য ভূমিকা রাখে” এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্ক করবে।

পাঠ ৮

সালাতের সময় সূচি (أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ)

যথাসময়ে নামায আদায় করা আল্লাহর আদেশ। সময়মতো নামায আদায় করা ফরয। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা’আলা বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“নির্ধারিত সময়ে সালাত কায়ম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” (সূরা আন- নিসা: ১০৩)

সালাতের সময়

ফজর : ফজরের সালাতের সময় আরম্ভ হয় সুবহি সাদিক হওয়ার সাথে সাথে এবং সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এর সময় থাকে। আকাশের পূর্ব দিগন্তে লখমান যে আলোর রেখা দেখা দেয় তাকেই বলে সুবহি সাদিক। আলো ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শেষে সূর্যোদয় ঘটে। রাসুলুল্লাহ (স.) বলেন : “সুবহি সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত ফজর সালাতের সময়।” (মুসলিম)

যুহর : ঐশ্বহরের পর সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেই যুহরের সময় শুরু হয়। প্রত্যেক বস্তুর ছায়া 'ছায়া আসলি' বাদ দিয়ে বিগুণ হওয়া পর্যন্ত এই সময় থাকে। কোনো বস্তুর ঠিক দুপুরের সময়ে যে একটু ছায়া থাকে তাকেই 'ছায়া আসলি' বা আসল ছায়া বলে। যেমন এক হাত লম্বা একটি কাঠির আসল ছায়া দুপুরবেলা চার আঙ্গুল ছিল। তারপর ঐ কাঠির ছায়া যখন দুই হাত চার আঙ্গুল হবে তখন যুহরের সময় শেষ হয়ে যাবে।

আসর : যুহরের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলে আসরের নামায আদায় করা মাকরুহ। আল্লাহ তা'য়ালার বলেন : তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হবে, বিশেষত মধ্যাহ্নী সালাতের। (সূরা আল-বাকারা : ২৩৮)

মাগরিব : সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে যতক্ষণ লালিমা থাকে ততক্ষণ সময় থাকে। মাগরিবের সময় খুবই কম। তাই সময় হওয়ার সাথে সাথেই নামায আদায় করে নেওয়া উত্তম।

ইশা : মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর ইশার নামাযের সময় শুরু হয় এবং সুবহি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তবে রাতের প্রথম প্রহরের মধ্যে ইশা আদায় করা উত্তম। রাত ঐশ্বহরের পর আদায় করা মাকরুহ। (তিরমিযি)

বিতর : বিতর এর আসল সময় শেষরাত। তবে ইশার নামাযের সাথেও আদায় করা যায়। কিন্তু ইশার আগে পড়া যায় না। (তিরমিযি)

কাজ : শিক্ষার্থীরা “সালাত আদায় অত্যাবশ্যক কেন” এ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৯

সালাত আদায়ের নিয়ম

প্রতিটি কাজেরই একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। নিয়মমতো কাজ করলে সফল পাওয়া যায়। নামায একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইহা মহানবি (স.) প্রদর্শিত পন্থায় আদায় করা অত্যন্ত জরুরি। এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেন : “তোমরা নামায আদায় কর হেমনিজাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ।” (বুখারি)

কোনো প্রকার ভুল হলে নামাযের ক্ষতি হয়। এতে বান্দার গুনাহ হয়। বিনীত ও একান্ত্রিণ্ডে সালাত আদায় করতে হয়। লোক দেখানো কিংবা উদাসীনভাবে আদায়কৃত সালাত আল্লাহ করুল করেন না। আল্লাহ বলেন:

“সুতরাং দুর্ভাগ্য সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোকদেখানোর জন্য ওটা (সালাত) আদায় করে।” (সূরা আল মাদিন : ৪-৬)

নামায আদায় কালে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, নামাযের শর্তগুলোর কোনটিই যেন বাদ না পড়ে। পবিত্র হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি আমাকে দেখছেন।

দুই, তিন ও চার রাকআত বিশিষ্ট নামায আদায়ের নিয়মে কিছুটা তারতম্য আছে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হলো :

দুই রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে নিয়ত করে দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত তুলে 'আল্লাহ্ আকবার' বলে নাভির নিচে হাত বাঁধব। তবে নারীগণ হাত বাঁধবে বুকের উপর। নিয়ত মনে মনে করলেই চলবে। তবে মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। এরপর 'সানা' পড়ব। এরপর অড়িযু বিদ্বাহি মিনাশ শহিতানির রাজিম, বিস্মিদ্দাহির রাহ্মানির রাহিম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। ফাতিহা পড়ে মনে মনে 'আমিন' বলব। এরপর অন্য কোনো সূরার কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত কিংবা একটি সূরাপড়ব। তারপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে রুকু করব। রুকুতে কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযিম' বলব। তারপর 'সামি আল্লাহ্‌লিমান হামিদাহ্' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। দাঁড়ানো অবস্থায় 'রাক্বানা লাকাল হামদ' বলব। তারপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে সিজদাহ করব। সিজদায় অন্তত তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলব। তারপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে সোজা হয়ে বসব। আবার 'আল্লাহ্ আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজদাহ করব। এবারও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' বলব। এরপর 'আল্লাহ্ আকবার' বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এভাবে প্রথম রাকআত শেষ হবে। এখন দ্বিতীয় রাকআত শুরু হলো। বিস্মিদ্দাহির রাহ্মানির রাহিম বলে সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর পূর্বের মতো সূরা মিলাব। তারপর প্রথম রাকআতের মতো রুকু ও সিজদাহ করে সোজা হয়ে বসব। তাশাহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে ও বামে দুখ ফিরিয়ে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ' বলব। এইভাবে দুই রাকআত বিশিষ্ট নামায শেষ হবে।

তিন রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

তিন রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের পর শুধু তাশাহুদ পড়ব। তারপর তাকবির বলে সোজা হয়ে দাঁড়াব। এরপর বিস্মিদ্দাহির রাহ্মানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। অন্য কোনো সূরা পড়ব না। এরপর পূর্বের মতো রুকু সিজদা করব। সিজদাহ পর সোজা হয়ে বসে তাশাহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব।

চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম

চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয নামাযে দ্বিতীয় রাকআতের পর শুধু তাশাহুদ পড়ব। পরে তৃতীয় রাকআতের জন্য তাকবির বলে উঠে দাঁড়াব। এরপর বিস্মিদ্দাহির রাহ্মানির রাহিম বলে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ব। তারপর রুকু সিজদা করে, চতুর্থ রাকআতের জন্য উঠে দাঁড়াব। চতুর্থ রাকআতে তৃতীয় রাকআতের মতো সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু, সিজদা করার পর বসে তাশাহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে ডানে বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করব। ওয়াজিব, সুন্নাত বা নফল নামায হলে তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই উপকরণের মাধ্যমে নামায আদায়ের নিয়ম শ্রেণিতে অনুশীলন করবে। শিক্ষক মহোদয় সহযোগিতা করবেন।

পাঠ ১০
সালাতের ফরয (فَرَائِضُ الصَّلَاةِ)

সালাত (নামায) সহিহ বা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কতগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় রয়েছে। যার কোনো একটি ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক, বাদ পড়লে নামায বাতিল হয়ে যাবে। নামাযে মোট ফরয চৌদ্দটি। নামাযের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে নামাযের আহকাম বলা হয়।

১. শরীর পবিত্র হওয়া।
২. পরিধানের কাপড় পবিত্র হওয়া।
৩. নামাযের স্থান পবিত্র হওয়া। কমপক্ষে দাঁড়ানোর জায়গা থেকে সিজদার জায়গা পর্যন্ত পবিত্র হতে হবে।
৪. সতর ঢাকা। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং নারীদের মুখমন্ডল, দু'হাতের কব্জি, পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা।
৫. কিবলামুখী হওয়া। কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হবে। কিবলা অজানা অবস্থায় নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী কিবলা নির্ধারণ করে নামায আদায় করবে।
৬. নামাযের সময় হওয়া।
৭. নিয়ত করা। যে ওয়াক্তের নামায আদায় করবে মনে মনে সেই ওয়াক্তের সময়ের নিয়ত করা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাষায় নিয়ত করতে পারবে।

নামাযের ভিতরে সাতটি ফরয রয়েছে। এগুলোকে নামাযের আরকান বলা হয়।

১. তাকবিরে তাহরিমা: আত্লাহ্ আকবার বলে নামায আরম্ভ করা।
২. দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। দাঁড়িয়ে অঙ্কম হলে বসে এবং বসতে সক্ষম না হলে শয়নাবস্থায় ইশারায় নামায আদায় করতে হবে।
৩. সূরা বা আয়াত তিলাওয়াত করা।
৪. রুকু করা।
৫. সিজদাহ্ করা।
৬. শেষ বৈঠক-যে বৈঠকের মধ্যে তাশাহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করা হয় তাকেই শেষ বৈঠক বলে।
৭. সালামের মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়া।

কাজ : শিক্ষার্থীরা নামাযের আহকাম ও আরকানের সৎকিঞ্চি শিরোনাম পোস্টারে লিখবে। এরপর শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের ওয়াজিব

নামাযের ওয়াজিব বলতে এমন সব জরুরি বিষয় বোঝায় যার কোনো একটি তুলবশত ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু দ্বারা নামায শূন্য করতে হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে নামায (ফাসিদ) ভঙ্গ হয়ে যায় এবং পুনরায় নামায আদায় করতে হয়।

নামাযের ওয়াজিব চৌদ্দটি।

১. প্রত্যেক রাকাততে সূরা ফাতিহা পড়া।
২. সূরা ফাতিহার সাথে কোনো একটি সূরা বা সূরার অংশবিশেষ পাঠ করা।
৩. রুকু, সিজদাহ ও তিলাওয়াতের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা।
৪. নামাযের রুকনগুলো সঠিকভাবে আদায় করা।
৫. রুকু করার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো।
৬. দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।
৭. প্রথম বৈঠক অর্থাৎ তিন বা চার রাকআত বিশিষ্ট নামাযে দুই রাকআত পড়ার পর তাশাহুদ পড়ার জন্য বসা।
৮. তাশাহুদ পাঠ করা।
৯. ইমামের জন্য উচ্চস্বরে তিলাওয়াতের স্থলে উচ্চস্বরে এবং চূপে চূপে তিলাওয়াতের স্থলে চূপে চূপে তিলাওয়াত করা।
১০. বিতর নামাযে দোয়া কুনুত পাঠ করা।
১১. নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত পড়লে তিলাওয়াতে সিজদাহ করা।
১২. সিজদার মধ্যে উভয় হাত ও হাঁটু মাটিতে রাখা।
১৩. দুই ঈদে অতিরিক্ত ছয় তাকবির বলা।
১৪. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে নামায শেষ করা।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক দল নামাযের ওয়াজিবগুলোর নাম পোস্টারে লিখবে এবং শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের সুন্নত

রাসূলুল্লাহ (স.) নামাযের মধ্যে ফরয ওয়াজিব ছাড়াও কিছু আমল বা কাজ করেছেন কিন্তু এগুলো আদায়ের ব্যাপারে ফরয ওয়াজিবের ন্যায় জাগ্রিত করেননি। এগুলোকে বলা হয় সুন্নত। যদিও এগুলো ছুটে গেলে নামায নষ্ট হয় না কিংবা সাহা সিজদা নিতে হয় না, তথাপি এগুলো মেনে চলা উচিত। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) এভাবে নামায আদায় করেছেন এবং অন্যকেও আদায় করতে বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেন: “তোমরা নামায আদায় কর, যেমনিভাবে আমাকে নামায আদায় করতে দেখেছ।” (বুখারি)

সালাতের সুন্নত একুশটি। এগুলো নিম্নরূপ :

১. তাকবির তাহরিমা বলার সময় পুরুষের কানের লতি ও নারীদের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠানো। ২. তাকবির বলার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলো খুলে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা। ৩. নিয়ত করার পর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা। পুরুষের জন্য নাভির উপর এবং নারীর জন্য বুকের উপর হাত রাখা। ৪. তাকবির তাহরিমা বলার সময় মাথা অবনত না করা। ৫. ইমামের জন্য জোরে তাকবির বলা। ৬. সানা পড়া। ৭. আউযু বিস্তাহ পড়া। ৮. প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহার পূর্বে মনে মনে বিসমিল্লাহ পড়া। ৯. ফরয নামাযের তৃতীয়, চতুর্থ রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া। ১০. ফাতিহার পর আমিন বলা। ১১. সানা, আউযুবিস্তাহ, আমিন অন্তে বলা। ১২. এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যাওয়ার সময় তাকবির বলা। ১৩. রুকু এবং সিজদায় তাসবিহ পড়া। ১৪. রুকুতে মাথা ও কোমর সোজা রাখা এবং দুই হাতের আঙ্গুল দিয়ে উভয় হাঁটু ধরা। ১৫. রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের সামি আঙ্গুল লিমান হামিদাহ্ ও মুক্তাদির ‘রাব্বানা লাকাল হামদ’ বলা। ১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর দুই হাত, তারপর নাক এবং সর্বশেষ কপাল মাটিতে রাখা। ১৭. বসার সময় বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসে এবং ডান পা খাড়া রাখা। ১৮. তাশাহুদে লা ইলাহা এর ‘লা’ উচ্চারণের সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠানো। ১৯. শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পর দরুদ পড়া। ২০. দরুদের পর দোয়া মাসূরা বা এই জাতীয় কোনো দোয়া পড়া। ২১. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফিরানো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এবং প্রত্যেক দল নামাযের সুন্নতগুলো পোস্টার লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সালাতের মুত্তাহাব

নামাযে এমন কিছু কাজ আছে যা মেনে চললে সাওয়াব পাওয়া যায়, কিন্তু ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় না। এগুলোকে বলা হয় মুত্তাহাব। নামাযের কতিপয় মুত্তাহাব নিচে দেওয়া হলো :

১. নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা। ২. রুকুর সময় পায়ের ওপর, সিজদার সময় নাকের ওপর এবং বসে অসহায় কোলের ওপর দৃষ্টি রাখা। ৩. হাঁড়ি এলে, হাই উঠলে, কশি এলে যথাসম্ভব চেপে রাখার চেষ্টা করা। ৪. বীরহিবভাবে কুবআন পাঠ করা। ৫. সিজদার সময় উভয় হাতের মধ্যস্থানে মাথা রাখা। ৬. মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা পাঠ করা। ৭. একা একা নামায আদায় কালে রুকু, সিজদায় তাসবিহ তিনবারের বেশি (পাঁচ, সাত, নয় ইত্যাদি) পড়া

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণ

নামাযের শুরুতে আমরা নিয়ত করে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে হাত বাঁধি, একে বলা হয় তাকবিরে তাহরিমা। এই তাকবির বলার পর অন্য কোনো কাজ বা কথা বলা হারাম হয়ে যায়। যদি কেউ এমন করে ফেলে তবে নামায বাতিল হবে। কী কী কাজ করলে নামায ভেঙ্গে যায় তা আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন। নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. নামাযের মধ্যে কাউকে সালাম দিলে এবং সালামের উত্তর দিলে। ২. নামাযের মধ্যে কথা বললে। ৩. কিছু খেলে। ৪. কিছু পান করলে। ৫. শব্দ করে হাসলে। ৬. বিপদ বা কষ্টের কারণে উচ্চস্বরে কঁদলে। ৭. ব্যথা বা রোগের কারণে উহু আহু এরূপ শব্দ করলে। ৮. কুরআন মাজিদ দেখে পড়লে। ৯. কিবলার দিক থেকে মুখ ঘুরালে। ১০. দুই হাত দিয়ে কোনো কাজ করলে। ১১. মুক্তাদি ইমাম অপেক্ষা সামনে দাঁড়ালে। ১২. অগবির স্থানে সিজদাহ করলে। ১৩. দুনিয়ার কোনো কিছু প্রার্থনা করলে। ১৪. বিনা কারণে বারবার কাশি দিলে। ১৫. নামাযের কোনো ফরয বাদ গেলে। ১৬. কোনো সুসবোশে ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ বললে। ১৭. কোনো দুঃসবোশে ‘ইলালিল্লাহ্’ বললে। ১৮. ইতি দিয়ে ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ বললে। ১৯. হাতির উত্তরে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ্’ বললে। ২০. নিজের ইমাম ছাড়া অন্য কারো ভুল ধরলে। ২১. আমলে কাসির করলে (এমন কাজ করা যা দেখলে মানুষ মনে করবে, সে নামায পড়ছে না)।

সালাত মাকরুহ হওয়ার কারণ

এমন কিছু কাজ আছে যা করলে নামায নষ্ট না হলেও সাওয়াব কম হয়, সেগুলো সালাতের মাকরুহ কাজ। নিম্নে এমন কতকগুলো কাজের কথা উল্লেখ করা হলো :

১. নামাযে বিনা কারণে আবুল মটকানো। ২. আলসেমি করে খালি মাথায নামায আদায় করা। ৩. কাপড় খুলাবালি থেকে বাঁচানোর জন্য গুটিয়ে নেওয়া। ৪. পরনের কাপড়, বোতাম, দাড়ি ইত্যাদি অহেতুক নাড়াচাড়া করা। ৫. ময়লা ও অশালীন পোশাক পরে নামায আদায় করা। ৬. পেশাব পায়খানা চোপে রেখে নামায আদায় করা। ৭. নামাযে এসিক ওসিক তাকানো। ৮. সিজদায় দুই হাত কনুই পর্যন্ত বিছিয়ে দেওয়া। ৯. ইমামের মেহরবের ভিতরে দাঁড়ানো। ১০. প্রাণীর ছবিযুক্ত কাপড় পরা। ১১. আগের কাতারে জায়গা থাকলেও একাকী পিছনে দাঁড়ানো। ১২. ইশারায় সালাম করা। ১৩. শুধু কপাল অথবা শুধু নাক মাটিতে ঠেকিয়ে সিজদাহ করা। ১৪. বিনা কারণে শুধু ইমামের উচ্চস্বানে দাঁড়ানো। ১৫. বিনা কারণে চারজানু হয়ে বসা। ১৬. চোখ বন্ধ করে নামায আদায় করা। ১৭. তিলাওয়াত পূর্ব না করেই রকু'র জন্য ঝুঁকে পড়া। ১৮. সিজদার সময় পা মাটি থেকে ওপরে উঠানো। ১৯. নামাযে আয়াত, তাসবিহ আবুল দিয়ে গণনা করা। ২০. তিলাওয়াতে অসুবিধা হয় মুখে এমন কোনো জিনিস রাখা।

সালাতের নিষিদ্ধ সময়

তিন সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ : ১. ঠিক সূর্যোদয়ের সময়। ২. ঠিক বিপ্রহরের সময়। ৩. সূর্যাস্তের সময়, তবে কোনো কারণে ঐ দিনের আসরের নামায আদায় করা না হলে তা ঐ সময় আদায় করা যাবে কিন্তু মাকরুহ হবে।

সালাতের মাকরুহ সময়

১. ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত। ২. আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত। ৩. ফজরের সময় হলে ঐ সময়ের সূর্যাস্ত ছাড়া অন্য কোনো নামায পড়া। ৪. ফরয নামাযের জন্য যখন তাকবির দেওয়া হয় তখন অন্য নামায শুরু করা। ৫. যখন ইমাম জুমু'আর খুতবা নিতে থাকেন তখন কোনো নামায শুরু করা। ৬. ইশার নামায মঘরাবতের পরে পড়া।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে নামায ভঙ্গ হওয়ার কারণগুলো লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১ সিজদাহ (السَّجْدَةُ)

‘সিজদাহ’ আরবি শব্দ। এর অর্থ মাথা অবনতকরণ। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আঙ্গাছের সজ্জি লাভের জন্য বাশ্পা তার কপাল জমিনে রাখাকে সিজদাহ বলে।

সিজদাহের প্রকারভেদ

ফরয সিজদাহ: মানুষ নামায আদারের সময় হেসব সিজদাহ দিয়ে থাকে তাকে ফরয সিজদাহ বলে।

ওয়ারজিব সিজদাহ: ভুলবশত নামাযে কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে এবং সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে যে সিজদাহ দিতে হয় তাকে ওয়াজিব সিজদাহ বলে।

মুস্তাহাব সিজদাহ: কোনো নিয়ামত প্রাপ্ত হলে, বিশদমুক্ত হলে আঙ্গাছের কৃতজ্ঞতা প্রকাশে যে সিজদাহ দেওয়া হয় তাকে মুস্তাহাব সিজদাহ বলে।

সিজদায়ে সাহ: সিজদায়ে সাহ অর্থ ভুলের জন্য সিজদাহ। ভুলবশত নামাযে ওয়াজিব বাদ পড়লে, তা সংশোধনের জন্য নামাযের শেষ বৈঠকে দুটি সিজদাহ করা হয়, একেই সিজদায়ে সাহ বলে।

সিজদায়ে সাহ আদায় করার নিয়ম

নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরাব। তারপর ‘আঙ্গাছ আকবার’ বলে নামাযের সিজদাহর ন্যায় দুটি সিজদাহ করে তাশাহহুদ, দরুদ ও দোয়া মাসূরা পড়বে। তারপর দু’দিকে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে। সিজদায়ে সাহ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন: “আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। সুতরাং যখন আমি ভুলে যাব তখন তোমরা আমাকে ক্ষমা করিয়ে দেবে। যখন তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে সন্দেহ করবে তখন সে গজীর চিন্তা করে সঠিক বিষয়টি ঠিক করে নেবে। অন্তঃপার এর উপর ভিত্তি করে নামায পূর্ণ করবে এবং সালাম দিয়ে দুটি সিজদাহ করবে। (হুখারি ও মুসলিম)

সিজদায়ে সাহ ওয়াজিব হওয়ার কারণ

১. ভুলবশত নামাযের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে। ২. নামাযের কাজগুলো পরপর আদায় করতে বিলম্ব করলে যেমন: সূরা ফাতিহা পড়ার পর চুপ করে থাকলে, কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর কোনো সূরা পড়লে। ৩. কোনো ফরয আদায় করতে বিলম্ব হলে। ৪. নামায আদায়ে ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম হলে যেমন: রুকু’র আগেই সিজদাহ করলে। ৫. কোনো ফরয একবারের স্থলে একাধিকবার করলে। ৬. কোনো ওয়াজিবের রূপ পরিবর্তন করলে যেমন: সরবে তিলাওয়াতের স্থলে নীরবে এবং নীরবে তিলাওয়াতের স্থলে সরবে পড়লে।

মনে রাখা দরকার, প্রথম বৈঠক করতে ভুলে গেলে যদি দাঁড়ানোর পূর্বেই মনে পড়ে তা হলে বসে যাবো এবং বৈঠক পূর্ণ করব। আর যদি দাঁড়ানোর পর মনে পড়ে তা হলে বসব না। নামায শেষে সাহ সিজদাহ করবে।

কাজ : সিজদাহ সাহ ওয়াজিব হওয়ার কারণগুলো ছক আকারে লিখে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াত (سُجْدَةُ التِّلَاوَةِ)

পবিত্র কুরআন মজিদে কতগুলো আয়াত আছে যা পড়লে বা শুনলে সিজদাহ্ করা জরুরি। সিজদাহ্ আদায় না করলে শুনাহগার হবে। হাদিসে আছে, ‘যখন কেউ সিজদার আয়াত পড়ে সিজদাহ্ করে তখন শয়তান একপাশে বসে বিশাপ করতে থাকে এবং বলে, হায় আফসোস! আদম সন্তানদের সিজদাহর হুকুম দেওয়া হলো, তারা সিজদাহ্ করলো এবং জালালের দাবিদার হলো। আর আমাকে সিজদাহর হুকুম দেওয়া হলো আমি অস্বীকার করে জাহান্নামি হলাম।’ (মুসলিম)

সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ম

কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করে ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে সিজদাহ্ করতে হয়। সিজদাহ্ করার পর ‘আল্লাহ্ আকবার’ বলে উঠে দাঁড়াতে হয়। তাশাহুদ পড়া ও সালাম ফিরানোর প্রয়োজন নেই। সিজদায়ে তিলাওয়াতে একটি সিজদাহ্ করলেই চলবে।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের চারটি শর্ত

১. তাহারাৎ অর্থাৎ পবিত্র হওয়া। ২. সতর ঢাকা। ৩. কিবলামুখী হওয়া। ৪. সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করা।

সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থান

১. সূরা আল আরাফ আয়াত : ২০৬। ২. সূরা রাদ্ আয়াত : ১৫। ৩. সূরা আন নাহল আয়াত : ৪৯-৫০। ৪. সূরা বনী ইসরাইল আয়াত : ১০৭-১০৯। ৫. সূরা মারইয়াম আয়াত : ৫৮। ৬. সূরা আল-হাজ্জ আয়াত : ১৮। ৭. সূরা আল-ফুরকান আয়াত : ৬০। ৮. সূরা আন নামল আয়াত : ২৫-২৬। ৯. সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদাহ্ আয়াত : ১৫। ১০. সূরা সাদ আয়াত : ২৪। ১১. সূরা হা-মীম-আস-সাজদাহ্ আয়াত : ৩৮। ১২. সূরা আন নাজম আয়াত : ৬২। ১৩. সূরা আল ইন্শিকাক আয়াত : ২১। ১৪. সূরা আল আলাক আয়াত : ১৯।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং সূরার নাম ও আয়াত নম্বরসহ সিজদায়ে তিলাওয়াতের স্থানসমূহ ছক আকারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১৩ সালাতের নৈতিক শিক্ষা

সালাত (নামাজ) ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এর সাথে নৈতিকতা বিষয়টি বিশেষভাবে জড়িত। ইসলামি বিধান অনুযায়ী নামাজ আদায় করলে একেতো আত্মাহর আইন পালন করা হয়, অপরদিকে বান্দার পার্শ্ব জীবনেও নৈতিকতার উন্নতি ঘটে। আর কোনো মানুষের নৈতিকতার উন্নতি ঘটলে, দুনিয়াতে যেমনি পাবে সম্মান ও মর্যাদা তেমনি পরকালেও পাবে সুখ শান্তি।

নিচে নামাজের কতিপয় নৈতিক বিষয় বর্ণনা করা হলো :

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

নামাজ আদায়কারীকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকতে হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে একজন মুমিন যখন নামাজ আদায় করবে তখন তাকে অবশ্যই গুহু করতে হয়। আর নামাজের পূর্বশর্তসমূহের একটি হলো পবিত্রতা অর্জন করা যেমন : আত্মাহ তা'য়ালা বলেন :

وَأَنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“তোমরা অপবিত্র হলে পবিত্রতা অর্জন কর।” (সূরা আল-মায়দা : ৬)

নামাজের আগে রাসুলুল্লাহ (স.) মিসওয়াক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যথানিয়মে দাঁত পরিষ্কার করলে মুখে দুর্গন্ধ থাকে না। রোগের আশংকা থেকে নিরাপদ থাকে যায়। তিনি বলেন : “আমার উম্মতের উপর কষ্টকর না হলে আমি তাদের প্রতি নামাজে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।” (ইবনে মাজাহ)।

নামাজ আদায় করতে হলে দৈনিক পাঁচবার গুহু করতে হয় যা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় অঙ্গকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে সহায়তা করে। এটা নাক, মুখ, চোখ, দাঁত ও পোশাক পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার রাখার অত্যন্ত নীতি কৌশলও বটে। যদি মুসল্লির শরীর, জামাকাপড় ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাহলে অন্য মুসল্লির কষ্ট হয় না। বরং সুন্দর ও সুস্থ মন নিয়ে একে অপরের সাথে দাঁড়াতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার এ শিক্ষা নামাজ থেকেই পাওয়া যায়।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জনে সালাতের ভূমিকা বিষয়ক একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সময়ানুবর্তিতা

নামায নিয়মানুবর্তিতা ও সময়নিষ্ঠা শিক্ষা দেয়। একজন মু'মিন ব্যক্তিকে দৈনিক পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে নামায আদায় করতে হয়। এতে সে সময়ের প্রতি সচেতন হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে জামাআতে নামায অনুষ্ঠিত হয়। কোনো ব্যক্তি সময়মতো জামাআতে নামায আদায় করতে না পারলে সে জামাআতের সাওয়াব হতে বঞ্চিত হবে। কিছু সময় পরই নামায আদায় করতে হয় বলে সময়কে শিথিল করা যায় না। বরং সবসময়ই নামাযের আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য মু'মিন ব্যক্তিকে প্রস্তুত থাকতে হয়। পবিত্র কুরআনে আত্মাহু তা'য়াল্লা বলেন :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“নির্ধারিত সময়ে সালাত কয়েম করা মুমিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।” (সূরা আন- নিসা: ১০৩)

প্রতিদিন পাঁচবার নির্ধারিত সময়ে জামাআতে নামায আদায় করা মু'মিন বান্দাকে সময়নিষ্ঠ হতে এবং সময়ের প্রতি গুরুত্ব উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে। অকারণে তিনি সময় নষ্ট করেননা। সমাজের অপরাধের লোকের সাথে সময়মতো কর্তব্য কাজে অভ্যস্ত হয়।

এতে সে জীবনের সব কাজেই সময়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠে। আজকের শিশু আগামী দিনে জাতির কর্তব্য। প্রত্যেক মুসলিম দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের মাধ্যমে সময়নিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ হলে সে অবশ্যই একটি জাতির অমূল্য মানব সম্পদে পরিণত হবে। সময়মতো নামায আদায় করার মাধ্যমে একজন মুসলিম তার কর্মস্থলে যথাসময়ে কর্তব্য পালনের শিক্ষা গ্রহণ করবে। সে কোনো কাজ আগামী দিনের জন্য ফেলে রাখবে না। বরং যথাসময়ে কঠোর পরিশ্রমে ঐ কাজ সম্পন্ন করবে। দেশের সেনাবিভাগ কঠোর সময়ানুবর্তিতার দিকে মনোনিবেশ করে। এ বিভাগে কর্তব্যরত সৈনিকগণকে নির্ধারিত সময়ে বিউগল বেজে উঠলে শয্যা ত্যাগ করে ইউনিকর্ম পরিধান করে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ বা কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। দেশ রক্ষা ও শত্রুদের সঙ্ঘাতে আক্রমণের মোকাবিলায় জন্যই সৈন্যদেরকে এরূপ শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। অথচ তাদের জীবনে এরূপ দুসেময় নাও আসতে পারে। কিন্তু মুসলিমগণ অবিরত তাদের কর্তব্য পালনে নিয়োজিত। তাদের চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অসং ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে তাদের সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। মহান আত্মাহু দৈনিক পাঁচবার তাঁর মু'মিন বান্দাকে আহ্বানের মাধ্যমে নামাযের আহ্বান জানান। এ আহ্বানে আত্মাহুর সৈনিকগণ পৌঁড়ে আসবে এবং প্রমাণ করবে, সব সময় ও সকল অবস্থায় তারা আত্মাহুর হুকুম পালনে প্রস্তুত।

কাজ : “সময়ানুবর্তিতাই মানুষের ইহজীবনে সন্ধান বাড়ার”— এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কের আয়োজন করবে।

শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা মানে সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের জীবনে শৃঙ্খলার গুরুত্ব অপরিণীম। রাজ্যখাটে যানবাহন চালানায় চালককে যেমন একটি বিশেষ নিয়ম মানতে হয়। আর এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা থাকে। তেমনি মানুষের জীবনও একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির অধীনে আবদ্ধ। বিশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনা করলে বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আর যদি সুশৃঙ্খলভাবে জীবন পরিচালনা করে তাহলে নিজে যেমন উপকৃত হবে তেমনি সমাজের অন্য ব্যক্তিও নিরাপদে থাকবে। শৃঙ্খলার এই শিক্ষা নামায থেকেই পাওয়া যায়।

নামাযে একাধী হোক আর জামাআতবদ্ধ হোক বান্দাকে এক কিবলার দিকেই মুখ ফিরাতে হয়। একই সময়ে নির্দিষ্ট নামায আদায়ের জন্য একই ইমামের পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হয়। এভাবে নামায আদায়ের ফলে মুমিনের মাঝে শৃঙ্খলাবোধ, নেতার প্রতি আনুগত্যবোধ গড়ে ওঠে। সমাজে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, সকলে মিলেমিশে মীমাংসা করার শিক্ষা নামাযের মাধ্যমে লাভ করা যায়।

কাঙ্ক্ষা : নামায আদায়ের মাধ্যমে একজন মানুষ তার কর্মস্থলেও সুশৃঙ্খল হয়, এ বিষয়ে শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনা করবে।

একাগ্রতা

আত্মাহর সন্নিধ্য লাভের অন্যতম উপায় হচ্ছে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করা। নামাযের মাধ্যমে বান্দা আত্মাহর নিকট তার আবেদন নিবেদন পেশ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে। আর আত্মাহ তা'য়লা ও বান্দার আবেদন গ্রহণ করে থাকেন। তাহলে বান্দাকে অবশ্যই বিনয়ের সাথে নামাযে দাঁড়াতে হবে। যেমন, কুরআন মজিদে আত্মাহ তা'য়লা বলেন :

“তোমরা আত্মাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে।” (সূরা আল-বাকারা : ২৩৮)

নামায অবস্থায় বান্দার মন এলিক ওলিক ছোটোছুট করে অথচ নামাযি টেরও পায় না। কারণ, মানব মন কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করতে অভ্যস্ত। গভীর মনোযোগের সাথে কোনো কাজে নিয়োজিত না হলে মন স্থির থাকে না। তাহাড়া শয়তান হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে বান্দার সকল ইবাদত বিশেষত নামায নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন বিষয় মনের মধ্যে হাজির করে দেয়। তাই বান্দার মন নামাযে ঠিক থাকে না। এ জন্যই বান্দাকে খুত খুত (বিনয় ও একাগ্রতা) ও মনের স্থিরতার সাথে নামায আদায় করতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আত্মাহ বলেন, “মুমিনগণ অবশ্যই সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী।” (সূরা আল-মুমিনুন : ১, ২)

কাঙ্ক্ষা : 'একাগ্রতা হচ্ছে নামায কবুল হওয়ার একমাত্র উপায়।' শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবে।

নিয়মানুবর্তিতা

নামায মানুষকে নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। যে প্রশিক্ষণের মধ্যে মানবজাতির কল্যাণ নিহিত। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষ যা অর্জন করে তা নিচে বর্ণনা করা হলো:

১. মানুষ তার প্রভুর কর্তব্য পালনে অভ্যস্ত হয়।
২. সমাজে কে অনুগত আর কে বিদ্রোহী নামায তা নির্ধারণ করে দেয়।
৩. মানুষকে ইসলামের পরিপূর্ণ আদর্শ মানব হিসেবে গড়ে তোলে এবং তাকে ইসলামের উপর সুদৃঢ় থাকতে সাহায্য করে।
৪. এটি বান্দার চরিত্র শক্তিকে আরও দৃঢ় করে।

নামায মানব চরিত্রের দুর্বলতা দূর করে। সাত বছর বয়সে ছেলেমেয়েদের নামাযের তাগিদ দিতে বলা হয়েছে। এতে তারা শিখিলতা করলে দশ বছর বয়সে তাদের প্রহার করে নামাযে অভ্যস্ত করে তোলার নির্দেশ রয়েছে। নামায আদায়ের দায়িত্ব হতে কেউ রেহাই পায় না। নামাযের সময় হলে সকল মুমিন ব্যক্তি সর্বাবস্থায় নামায আদায় করতে বাধ্য।

যে ব্যক্তি নিয়মনীতি মেনে, সময়নিষ্ঠ হয়ে একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করবে, সে অবশ্যই হবে একজন দায়িত্ব সচেতন, সুশৃঙ্খল ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। এমন ব্যক্তি সমাজে শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে নামায থেকে নিয়মানুবর্তিতা ও সাম্যের যেসব শিক্ষা পাওয়া যায়-তার তালিকা প্রণয়ন করবে।

সাম্য

জামাআতে নামায আদায়কারী মুসল্লিগণ মসজিদে একত্র হয়ে একই কাতারে দাঁড়িয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হয়। সকল মুক্তাদিই ইমামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। তখন ধনী-গরিব, আমীর-ফকীর, শাসক-শাসিত, ছোট বড় ভেদাভেদ থাকে না। মসজিদে ইমাম মুহাম্মাদিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য স্থান নির্ধারিত থাকে না। এটি ইসলামি জাতৃত্ব ও সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক। সমাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। সামাজিক যে কোনো সমস্যা সমাধানে একতাবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসে এবং শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে সক্ষম হয়।

সাম্য ও জাতৃত্ববোধের এ শিক্ষা একজন মুমিনকে সমাজের অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সহানুভূতিশীল, দায়িত্বশীল ও সহযোগিতার মনোভাব সম্পন্ন করে গড়ে তোলে। এতে সমাজে ছোট-বড়, ধনী-গরিব প্রেরণ-বৈষম্য ইত্যাদি দূর হয় এবং অতুলনীয় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এর ফলেই সমাজে কোনো রকম কলহ-বিবাদ থাকতে পারে না। বরং প্রতিষ্ঠিত হয় একটি আদর্শ সমাজ।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. পবিত্র থাকলে সুস্থ থাকে ।
২. পবিত্রতা ও অপবিত্রতার মানদণ্ড হচ্ছে ।
৩. ভালোভাবে ওদু করলে মন থাকে ।
৪. আল্লাহর নিকট বান্দার আনুগত্য প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে..... ।
৫. নিচয়ই হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. তায়াম্মুমের	ফরজ চারটি
২. সালাতের আরকান	ফরজ তিনটি
৩. ওদু	ফরজ
৪. সালাতে সুরা	সাতটি
৫. সতর ঢাকা	ফাতিহা পড়া ওয়াজিব

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ইবাদত কত প্রকার ও কী কী ? প্রত্যেক প্রকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও ।
২. তায়াম্মুম বলতে কী বুঝ ?
৩. সালাতে একপ্রতা বলতে কী বোঝায় ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পবিত্র থাকার উপায় ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা কর ।
২. দুই রাকাত বিশিষ্ট সালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর ।
৩. বাস্তবজীবনে সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব আলোচনা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ইবাদত কত প্রকার ?

- ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ।

২. ইবাদতের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে -

- ক. আত্মাহুতের সন্তুষ্টি অর্জন
খ. রাসুলের সন্তুষ্টি অর্জন
গ. সাহাবিদের সন্তুষ্টি অর্জন
ঘ. তাবিসীদের সন্তুষ্টি অর্জন।

৩. কোনটি ইবাদতে মালি ও ইবাদতে বাদানির অন্তর্গত?

- ক) হজ খ) যাকাত
গ) সাওম ঘ) সালাত।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রিসাম যষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। সে আখ্যান গুলো তাড়াতাড়ি শুধু করে মসজিদে গেল। জামাআত তরফ থেকে তার বন্ধু রিসাম তাকে বলেদো, তোমার গোড়ালির পেছনের অংশ তরফে।

৪. এমতাবছার রিসামের করণীয় হচ্ছে -

- i. পুনরায় শুধু করা
ii. তরফে অংশটুকু ধোঁত করা
iii. রিসামের কথা শুধু শুধু না দেওয়া।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক) i
খ) ii
গ) iii
ঘ) i, ii।

৫. রিসামকে শুধু সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ায় রিসাম কী লাভ করবে ?

- ক) পুণ্য
খ) জালাত
গ) জালাতের ফল
ঘ) জালাতের সুবাস।

সুজনশীল প্রশ্ন

১. শোয়াইব ও মুরীয একই অফিসে চাকরি করেন। আযান হলেই শোয়াইব মসজিদে যায়। সে তাঁর কর্মস্থলে কর্তব্যপূরণ ও সময়নিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। তাঁর কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ হয়ে তাঁর সহকর্মী মুরীয বললো, “নিচয়ই নামাজ মানুষকে অশ্রীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।”

ক. ইবাদত শব্দের অর্থ কী?

খ. নামাজাত বর্ণনীয় কেন?

গ. কোন ইবাদত শোয়াইবকে তার কর্মস্থলে প্রশংসিত করেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মুরীযের সর্বশেষ উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. দিয়া প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে। সালাত আদায় করে এবং পাঠে মনোনিবেশ করে। বার্ষিক পরীক্ষায় সে ভাল ফল লাভ করেছে। দিশা আলসেমি করে দেহিতে ঘুম থেকে ওঠে এবং নিয়মিত সালাত আদায় করে না। এজন্য বাবা-মা প্রায়ই বলে যে দিশা ফজরের নামায না পড়ার ফলে সকালে পড়ালেখার জন্যে যথেষ্ট সময় পায় না। বার্ষিক পরীক্ষায়ও দিশা সন্তোষজনক ফল লাভ করতে পারেনি।

ক. সালাত শব্দের অর্থ কী?

খ. পবিত্রতা মানুষের মধ্যে কী প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন গুণটি দিয়ার জীবনে ভালো ফল লাভে ভূমিকা রেখেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দিশার ব্যর্থতার কারণ ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন ও হাদিস শিক্ষা

কুরআন মজিদ হলো মহান আদ্বাহর পবিত্র বাণী। আর মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে বলা হয় হাদিস। কুরআন মজিদ ও হাদিস শরীফ হলো ইসলামের প্রধান দুটি উৎস। মহানবি (স) বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা অঁকড়ে ধরলে (মেনে চললে) তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটি হলো আদ্বাহর কিতাব (আল-কুরআন) ও তাঁর রাসুলের সূনাত (আল-হাদিস)।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আল-কুরআনের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- আল কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফজিলত ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাজবিস এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব ও মাখরাজ আয়ত্ত করে বিতচ্ছভাবে কুরআন পাঠ করতে সক্ষম হব।
- কুরআনের নির্ধারিত পাঁচটি সূরা অর্থসহ মুখস্থ বলতে ও মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নির্ধারিত পাঁচটি সূরার পটভূমি (শানে মুহুল) ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক (প্রার্থনামূলক) তিনটি আয়াত অর্থসহ বলতে পারব।
- হাদিসের পরিচয় ও গুরুত্ব এবং নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক দুটি হাদিসের অর্থসহ শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।
- মুনাজাতমূলক দুটি হাদিস অর্থসহ বলতে পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হাদিসের আলোকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ ১

আল কুরআনের পরিচয়

পরিচয়

কুরআন মজিদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এটি মহান আদ্বাহর বাণী। মানব জাতির হিদায়াতের জন্য আদ্বাহ তা'য়ালা শেষ নবি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর এ কিতাব নাখিল করেন। আদ্বাহ তা'য়ালায় পরিচয়, তাঁর গুণাবলি, ইমান ও ইসলামের সকল বিষয় এতে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সারকথা। কোন পথে চললে মানুষ সফলতা লাভ করবে তাও এতে বলে দেওয়া হয়েছে।

এটি মহান আদ্বাহর পবিত্র বাণী। আজ পর্যন্ত এটি অবিকৃত রয়েছে। কেউ এর একটি নুকতা, অক্ষর, শব্দ বা হরকাতও পরিবর্তন করতে পারে নি। আর ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা, এর সংরক্ষক স্বয়ং আদ্বাহ তা'য়ালা।

কুরআন মজিদ অবতরণ

আল-কুরআন সর্বশেষ নবি ও রাসুল হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এটি 'লাওহি মাহফুয'- বা সুরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) আরবদেশের মক্কা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার লোকজন ছিল মূর্তিপূজক। তাদের মধ্যে প্রায়ই মারামারি, কাটাকাটি ও কলহ-বিবাদ লেগেই থাকত। মহানবি (স.) এসব পছন্দ করতেন না। তিনি ভাবতেন যে, সকল মানুষের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। তাঁর দেখানো পথে চললে সমাজে কোনোরূপ অশান্তি থাকবে না। এজন্য তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। চতুর্দশ বছর বয়সে তিনি নবুয়াতপ্রাপ্ত হন। আদ্রাহ তা'য়াল্লা জিবরাইল (আ.) ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁর নিকট আল-কুরআন নাখিল করেন। এ সময় আল কুরআনের সূরা আল আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নাখিল হয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুসারে কুরআনের নানা আয়াত নাখিল করা হয়। এভাবে মহানবি (স.)-এর ওপর ২৩ বছরে পবিত্র কুরআন সম্পূর্ণরূপে নাখিল হয়।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্য

আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানি কিতাব। আদ্রাহ তা'য়াল্লা সর্বমোট ১০৪ (একশত চার) খানা আসমানি কিতাব নাখিল করেছেন। এগুলোর মধ্যে ১০০ (একশত) খানা ছোট কিতাব। এগুলোকে বলা হয় সহিফা। আর ৪ (চার) খানা বড়। এগুলো হলো- তাওরাত, ইনজিল ও কুরআন। আল-কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি গ্রন্থ। এরপর আর কোনো কিতাব আসবে না।

কুরআন মজিদ সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এতে দীনের যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের জীবনে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে তার সমাধানের ব্যাপারে এতে নির্দেশনা রয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবসমূহের মূল শিক্ষাও এতে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং আল-কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব।

আল-কুরআন আদ্রাহ তা'য়ালার বাণী। এর ভাব ও ভাষা অনন্য ও অপূর্ব। এটি মহানবি (স.)-এর সবচেয়ে বড় মুজিবা। কেউই এর ক্ষুদ্রতম সূরার সমতুল্য কিছু রচনা করতেও সক্ষম হয় নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না।

আল-কুরআনের গুরুত্ব

আল কুরআন জ্ঞানসমূহের ভাণ্ডার। এতে রয়েছে আদ্রাহ তা'য়ালার পরিচয়, তাঁর গুণাবলির বর্ণনা, তাঁর ক্ষমতা ও নিয়ামতসমূহের বর্ণনা। আল-কুরআনে মানব সৃষ্টির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। সৌরজগৎ, আসমান-জমিন, নক্ষত্ররাজি, পাহাড়-পর্বত সবকিছু সম্পর্কেই এতে উল্লেখ করা হয়েছে। পূর্ববর্তী জ্ঞানসমূহের ঘটনা, নবি-রাসূলগণের বিবরণ, পুণ্যভান ও পাপীদের অবস্থা ইত্যাদিও আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কুরআনে নানা রকম বিধি-বিধান ও আইন-কানুন বর্ণিত হয়েছে। এটি সভ্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। কীভাবে চললে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি লাভ করবে এর দিকনির্দেশনাও আল-কুরআনে দেওয়া আছে। আল-কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। এতে দীনের সকল কিছুই জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে। আল-কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। সুতরাং আমরা আল-কুরআন পড়ব এবং এর নানাবিধ জ্ঞান অর্জন করব।

পাঠ ২ কুরআন তিলাওয়াত (تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ)

পরিচয়

তিলাওয়াত আরবি শব্দ। এর অর্থ পাঠ করা, পড়া, আবৃত্তি করা। পবিত্র কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলা হয়।

আল-কুরআন আরবি ভাষায় নাখিল হয়েছে। সুতরাং একে আরবিতেই পড়তে হবে। এজন্য আরবি হরফ বা বর্ণসমূহ তিনে তিলাওয়াত করা শিখতে হবে। এভাবে আরবিতে সুন্দর করে স্পষ্ট উচ্চারণে আল-কুরআন পাঠ করাকে কুরআন তিলাওয়াত বলে।

উল্লেখ্য, কুরআন শব্দটির মূল অর্থ পাঠ। অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়েছে। সারা বিশ্বে আল-কুরআনই সবচেয়ে বেশি পাঠ (তিলাওয়াত) করা হয়। এজন্যই একে কুরআন বলা হয়। মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচবার সালাতে কুরআন তিলাওয়াত করেন। এছাড়া আমরা অন্য সময়েও কুরআন তিলাওয়াত করে থাকি।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব

কুরআন মজিদ তিলাওয়াতের গুরুত্ব অনেক। এটি আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এতে মানুষের কল্যাণের দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের উচিত বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা। কুরআন তিলাওয়াত করলে আমরা আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ জানতে পারব। বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করা উত্তম।

আমাদের গ্রিহনবি (স.) এবং তাঁর সাহাবিগণ প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করতেন, কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী আমল করতেন। কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা সালাতে (নামাযে) কুরআন পড়তে হয়। আর কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। সুতরাং আমরা গুরুত্ব সহকারে শুদ্ধরূপে কুরআন তিলাওয়াত শিখব এবং প্রতিদিন তিলাওয়াত করব।

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত

কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত (মাহাত্ম্য) অনেক বেশি। কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করা হলো নফল ইবাদতের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত। কুরআন তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হন। যে ঘরে কুরআন পড়া হয় সে ঘরে আল্লাহ পাকের রহমত নাখিল হয়। মহানবি (স.)-এর হাদিসে আছে, পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফের পরিবর্তে দশটি করে নেকি লেখা হয়। সুতরাং বোঝা গেল যে, কুরআন তিলাওয়াত অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ কাজ। আমরা সবাই বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করব।

নাযিরা তিলাওয়াত

আল-কুরআন দেখে দেখে পড়াকে নাযিরা তিলাওয়াত বলে। কুরআন মজিদ দেখে পড়াও উত্তম ইবাদত। কুরআন মজিদ দেখে দেখে অথবা মুখস্থ যেভাবেই পাঠ করা হোক তাতে পুণ্য রয়েছে। কুরআন পাঠ মনে প্রশান্তি আনে। অন্তর-আত্মা পরিষ্কৃত হয়। কিয়ামতের দিন কুরআন আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করবে যারা পৃথিবীর জীবনে কুরআন মজিদ তিলাওয়াত করতো।

পাঠ ৩ তাজবিদ (التَّجْوِيدُ)

তাজবিদ

তাজবিদ শব্দের অর্থ উত্তম বা সুন্দর করা। আল-কুরআনের আয়াতসমূহকে উত্তমরূপে বা সুন্দর ও শুদ্ধ করে পড়াকে তাজবিদ বলা হয়। অর্থাৎ আল-কুরআনের প্রতিটি হরফকে মাখরাজ ও সিফাত অনুসারে বিতৃষ্ণভাবে তিলাওয়াত করাকে তাজবিদ বলে।

আরবি হরফ কোনোটি মোটা করে পড়তে হয়, আবার কোনোটি চিকন করে পড়তে হয়। উচ্চারণের এ বিশেষ অবস্থাকে বলা হয় সিফাত। যেমন- ١ (তা) এবং ٢ (ত্বা) হরফ দুটির উচ্চারণের স্থান একই। কিন্তু এদের সিফাত ভিন্ন। এ দুটো বর্ণের মধ্যে ٢ (ত্বা)-কে মোটা করে পড়তে হয় এবং ١ (তা)-কে চিকন করে পড়তে হয়। আবার মাখরাজ হলো উচ্চারণের স্থান। যেমন- ٣ এবং ٤ এখানে হরফ দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে উচ্চারণ করতে হয়। এভাবে মাখরাজ ও সিফাত ঠিক রেখে সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াত করাই তাজবিদ।

তাজবিদের গুরুত্ব

তাজবিদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব বা আবশ্যিক। তাজবিদ অনুসারে কুরআন না পড়লে গনাহ হয়। এতে অনেক সময় আল-কুরআনের অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়। আর অন্তর্দৃষ্টি তিলাওয়াতের ফলে সালাতও পূর্ণাঙ্গ হয় না। যেমন- সূরা ইখলাসে এসেছে- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ — বলুন (হে নবি)! তিনি আত্মাহ: একক ও অদ্বিতীয়। এখানে قُل শব্দের অর্থ- বলুন। আর যদি ق (ক্বাফ)-কে তুল মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করে বলা হয় ٥ তাহলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। কেননা ٥ শব্দের অর্থ ঋণ বা ভক্ষণ কর। ফলে আল-কুরআনের অর্থের বিকৃতি ঘটে। যা কোনোভাবেই জায়েজ নয়। তাজবিদ সহকারে শুদ্ধ ও সুন্দর করে কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব উপলব্ধি করে আত্মা তা'য়্যার বশেন- وَرَبِّكَ الْقَوَّانُ تَزِيلًا

অর্থ: আপনি কুরআন আবৃত্তি করুন ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে। (সূরা আল-মুমযাখিল : ৪)

তাজবিদ সহকারে কুরআন পড়া আত্মা পাকের নির্দেশ। আর শুদ্ধরূপে কুরআন শিকার মাহাদ্ব্য অনেক। রাসুল্লাহ (স.) বলেছেন- 'عَزَّوَجَدَّ عَنْ تَعْلَمُ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ' 'তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।' (বুখারি)

সুতরাং আমরা তাজবিদ সহকারে নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করব।

পাঠ ৪
মাখরাজ (الْمَخْرُجُ)

পরিচয়

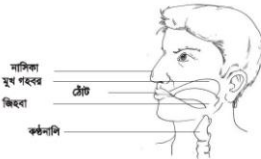
মাখরাজ শব্দের অর্থ বের হওয়ার স্থান, উচ্চারণের স্থান। আরবি হরফসমূহ মুখের যে স্থান থেকে উচ্চারিত হয় সে স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

আরবি হরফ (বর্ণ) মোট ২৯টি। এগুলো মুখের মোট ১৭টি স্থান থেকে উচ্চারিত হয়। এ ১৭টি স্থানকে বলা হয় মাখরাজ। মাখরাজ মোট ১৭টি।

১৭টি মাখরাজ আবার মুখের ৫টি স্থানে অবস্থিত। যথা- (১) কণ্ঠনালি বা হলক, (২) জিহ্বা, (৩) উভয় ঠোঁট, (৪) নাসিকামূল এবং (৫) মুখের খালি জায়গা বা জাওফ।

নিম্নে হক আকারে কোন স্থানে কয়টি মাখরাজ অবস্থিত তা দেখানো হলো :

মুখের স্থান	মাখরাজ সংখ্যা
১. জাওফ বা মুখের খালি জায়গা	০১ টি
২. হলক বা কণ্ঠনালি	০৩ টি
৩. জিহ্বা	১০ টি
৪. উভয় ঠোঁট	০২ টি
৫. নাসিকামূল	০১ টি



মাখরাযের বিস্তারিত বিবরণ

১. প্রথম মাখরায হলো জাওফ। জাওফ হলো মুখের ভিতরের খালি জায়গা। এ স্থান থেকে ৩৩টি হরফ উচ্চারিত হয়। যথা :

ক. আলিফ (ا) যখন এর পূর্বের হরফে যবর থাকে। যেমন : كُ

খ. জযম বিশিষ্ট ওয়াও (و) যখন এর পূর্বের হরফে পেশ হয়। যেমন- عُ

গ. জযম বিশিষ্ট ইয়া (ي) যখন এর পূর্বের হরফে ফের হয়। যেমন- يُ

এ হরফ তিনটি মুখের খালি স্থান থেকে বাতাসের উপর উচ্চারিত হয়। এতে জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট, কণ্ঠনালি কোনো কিছুই ব্যবহার হয় না। এগুলোকে মাদ এর হরফ বলা হয়। অর্থাৎ এগুলো পড়ার সময় এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়তে হয়।



২. কণ্ঠনালির নিম্নভাগ থেকে উচ্চারিত হয় দুটি হরফ। এ দুটি হলো- হামযা (ه) ও হা (ح)। যেমন : هـ-أ

কণ্ঠনালির নিম্নভাগ



৩. কণ্ঠনালির মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হয় ২টি হরফ। এ দুটি হলো- হা (ح) ও আইন (ع)। যেমন- ح-ع

কণ্ঠনালির মধ্যভাগ



৪. কণ্ঠনালির উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয় ২টি হরফ। এ দুটি হলো- খা (خ) ও গাইন (غ)। যেমন- غا
- غا

কণ্ঠনালির উপরিভাগ



উপরিউক্ত ছয়টি হরফ কণ্ঠনালি বা হলক নামক স্থান হতে উচ্চারিত হয়। এ জন্যে এ ৬টি হরফকে হরফে হলকি বা কণ্ঠবর্ণ বলা হয়।

৫. পঞ্চম মাখরাজ হলো জিহ্বার গোড়া এবং তার বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে একটি হরফ উচ্চারিত হয়। এটি হলো ক্যফ (ق) যেমন- ق

জিহ্বার গোড়া এবং তার
বরাবর উপরের তালু



৬. জিহ্বার গোড়ার সামান্য উপরের অংশ এবং এর বরাবর উপরের তালু। এ স্থান থেকে ক্যফ (ك) হরফটি উচ্চারিত হয়। যেমন- كا

জিহ্বার গোড়ার সামান্য উপরের অংশ এবং এর
বরাবর উপরের তালু



৭. জিহ্বার মধ্যভাগ এবং এর সোজা উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে তিনটি হরফ উচ্চারিত হয়।

এগুলো হলো জিম (ج), শিন (ش), ইয়া (ي)। যেমন- عی-ئ-ئی

জিহ্বার মধ্যভাগ এবং এর সোজা
উপরের তালু



৮. অষ্টম মাখরাজ হলো জিহ্বার পার্শ্বভাগ ও উপরের পাটির দাঁতের মাড়ি। এ দুয়ের সংযোগে উচ্চারিত হয় দোয়াদ (ض) হরফটি।

জিহ্বার পার্শ্বভাগ ও উপরের
পাটির দাঁতের মাড়ি



এ হরফটি উচ্চারণে জিহ্বার পার্শ্বভাগকে ডান দিক অথবা বাম দিকের উপরের দাঁতের মাড়ির সাথে লাগিয়ে উচ্চারণ করা যায়। যেমন- عی

৯. জিহ্বার অগ্রভাগের পাশ ও সামনের উপরের দাঁতের গোড়ার দিকের তালুর সাথে মিলে উচ্চারিত হয় একটি হরফ। এটি হলো- লাম (ل)। যেমন- عی

জিহ্বার অগ্রভাগের পাশ ও সামনের
উপরের দাঁতের গোড়ার দিকের তালু



১০. জিহ্বার অগ্রভাগ ও তার বরাবর উপরের তালু। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় নুন (ن) হরফ।

যেমন- نَئ

জিহ্বার অগ্রভাগ ও তার বরাবর
উপরের তালু



১১. জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ এবং সোজা ওপরের তালু। এখান থেকে উচ্চারিত হয় বা (ب)। যেমন- بَئ

জিহ্বার অগ্রভাগের পিঠ এবং সোজা
উপরের তালু



১২. জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সামনের ওপরের দাঁতের গোড়া। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ।

এগুলো হলো তা (ت), দাল (د), ড়া (ظ)। যেমন- تَئ - دَئ - ظَئ

জিহ্বার অগ্রভাগ এবং সামনের
উপরের দাঁতের গোড়া



১৩. জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের নিচের দুই দাঁতের মাঝা এবং উপরের দাঁতের সামান্য অংশ মিলে উচ্চারিত হয় মোট ৩টি হরফ। এগুলো হলো- যা (ز), সিন (س), ছোয়াদ (ص)। যেমন- **آز - أس - إس**

জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের
নিচের দুই দাঁতের মাঝা এবং
উপরের দাঁত



১৪. জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের উপরের বড় দুই দাঁতের মাঝা। এখান হতে উচ্চারিত হয় ছা (ث), যাল (ظ), যোয়া (ذ)। যেমন- **آظ - آذ - آث**

জিহ্বার অগ্রভাগ ও সামনের
উপরের বড় দুই দাঁতের মাঝা



উপরিউক্ত দশটি (৫নং থেকে ১৪ নং পর্যন্ত) মাখরাজ জিহ্বার সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৫. নিচের ঠোঁটের ভেতরের অংশ বা ভিজা অংশ এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের মাঝা। এ মাখরাজ থেকে উচ্চারিত হয় ফা (ف)। যেমন- **آف**

নিচের ঠোঁটের ভেতরের অংশ বা
ভিজা অংশ এবং সামনের উপরের
দুই দাঁতের মাঝা

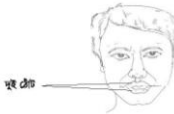


১৬. দুই চোঁট। এখান থেকে উচ্চারিত হয় তিনটি হরফ। যথা-

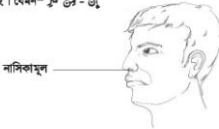
ক. বা (ب) উচ্চারিত হয় নিচের চোঁটের ভেতরের অংশ থেকে। যেমন- بَاب

খ. মিম (م) উচ্চারিত হয় চোঁটের বাইরের বা শুষ্ক অংশ থেকে। যেমন- مَاء

গ. ওয়াও (و) এ হরফ উচ্চারণে দুই চোঁট সরাসরি মিলিত হয় না। বরং উভয় চোঁট ডান ও বাম পাশ থেকে গোলা হয়ে অর্ধকোটা ফুলের মত মধ্যস্থলে খিল্লি রেখে উচ্চারিত হয়। যেমন- وَاسْط



১৭. শেষ মাথরাজ হলো নাসিকামূল। এখান থেকে শুন্নাফলমূহ উচ্চারিত হয়। যেমন- জযমযুক্ত নুনের কখনও কখনও গোপন করে নাসিকামূল থেকে উচ্চারণ করা হয়। তাশদিদযুক্ত নুনের মাথরাজও এটিই। যেমন- نُسْرَة - نُسْرَة - نُسْرَة



তাজবিনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো মাথরাজ। হরফ (বর্ণ) সমূহকে নিজ নিজ মাথরাজ (উচ্চারণস্থল) থেকে উচ্চারণ করা আবশ্যিক। সুতরাং আমরা হরফগুলোর মাথরাজ শিখব ও নিয়মিত অনুশীলন করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা

ক. আরবি ২৯টি বর্ণ লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

খ. ১৭টি মাথরাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

নতুন শব্দ পরিচয়

লাওহি মাহফুয	- সংরক্ষিত ফলক।
হিদায়াত	- দিকনির্দেশনা। সত্য দীনের প্রতি দিকনির্দেশনা প্রদান।
হরফ	- বর্ণ।
নুকতা	- আরবি বর্ণসমূহের উপরে নিচে বা মাঝে ব্যবহৃত বিন্দু বা ফেঁটাকে নুকতা বলে। যেমন- ن - ب - ت
হরকত	- যবর, ঘের, পেশকে হরকত বলে।
আয়াত	- আল-কুরআনের এক একটি বাক্যকে বলা হয় আয়াত।
জিবরাঈল (আ.)	- প্রধান ফেরেশতাগণের একজন। তিনি আদ্যাহ তা'আলার বাণী নিয়ে নবি-রাসুলগণের নিকট আসতেন।
মুজিয়া	- অলৌকিক ঘটনা বা বস্তু। নবি-রাসুলগণের দ্বারা প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা ও বস্তুকে মুজিয়া বলা হয়।
নাফিল	- অবতীর্ণ।
কালাম	- বাণী।
সাহাবা	- হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সাথীগণ। যারা মহানবি (স.)-কে ইমানসহ দেখেছেন এবং ইমানের সাথে মুতুবরণ করেছেন তাঁরা হলেন সাহাবা।
নফল	- ঐচ্ছিক, ফরজের অতিরিক্ত।
জায়েজ	- বৈধ, অবৈধের বিপরীত।

অর্থ ও পটভূমিসহ আল কুরআনের কতিপয় সূরা

পাঠ ৫

সূরা আল-ফাতিহা (سُورَةُ الْفَاتِحَةِ)

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম সূরা হলো আল-ফাতিহা। ফাতিহা শব্দের অর্থ ভূমিকা, মুখবন্ধ, দ্বার উন্মোচনকারী ইত্যাদি। যেহেতু এ সূরার মাধ্যমে কুরআনুল কারিম শুরু করা হয়, সেজন্য এ সূরার নাম আল-ফাতিহা। একে ফাতিহাতুল কিতাব বা ফাতিহাতুল কুরআনও বলা হয়। অর্থাৎ কিতাব বা কুরআনের ভূমিকা।

এ সূরাটি মাক্কী সূরা। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর হিজরতের পূর্বে এ সূরাটি মক্কা নগরীতে অবতীর্ণ হয়। পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এ সূরাই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা সর্বমোট ৭টি। সূরা আল-ফাতিহা কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এর বহু নাম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. সূরাতুল হামদ (প্রশংসার সূরা); এ সূরায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করা হয়েছে।
২. উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী); এ সূরা পবিত্র কুরআনের সার-সংক্ষেপস্বরূপ।
৩. সূরাতুস সালাত (সালাতের সূরা); সালাতের শুরুতে এ সূরা পাঠ করা অপরিহার্য। এ সূরা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হয় না।
৪. সূরাতুল শিফা (রোগমুক্তির সূরা); এ সূরার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
৫. সূরাতুল দোয়া (দোয়া বা প্রার্থনামূলক সূরা); এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা নিবেদন করা হয়।

শব্দার্থ

الْحَمْدُ	- সকল প্রশংসা	تَعَالَى	- আমরা ইবাদত করি
رَبِّ	- রব, প্রতিপালক	نَسْتَعِينُ	- আমরা সাহায্য প্রার্থনা করি
الْعَالَمِينَ	- সমগ্র সৃষ্টিজগৎ, জগৎসমূহ	إِهْدِنَا	- আমাদের পথ দেখাও
مَلِكٍ	- মালিক, অধিপতি	صِرَاطَ	- পথ, রাজ্য
يَوْمِ الدِّينِ	- বিচার দিবস, কর্মফল দিবস	الَّذِي	- তুমি অনুগ্রহ করেছ
إِلَهِكَ	- শুধু তোমরাই	الْعَصُوفِ	- জেনে নিপতিত
		الْحَيِّ	- পথ ঐষ্ট

অনুবাদ

○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

১. সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই।

○ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

২. যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু।

○ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ

৩. যিনি বিচার দিনের মালিক।

○ اِنَّكَ نَعْبُدُكَ وَاِلَیْكَ نَسْتَعِیْذُ

৪. আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই সাহায্য চাই।

○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

৫. আমাদের সরল পথ দেখাও।

○ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ

৬. তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ।

○ غَیْرِ الْمَغْضُوْٓیْنَ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

৭. তাদের পথ নয়, যারা ক্রোধ-নিপতিত ও পথভ্রষ্ট।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-ফাতিহা আল-কুরআনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরায় সম্পূর্ণ কুরআনের সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে। এর প্রথম তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা বর্ণনা করা হয়েছে। শেষ তিনটি আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট মানুষের মুনাজাত ও প্রার্থনার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। আর মধ্যবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা ও দোয়া একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য। কেননা তিনিই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তিনিই বিশ্বজগতের মালিক ও প্রতিপালক। সৃষ্টিজগতের সবকিছুই তাঁর রহমত ও করুণায় দালিত-পালিত হয়। তাঁর নিয়ামত সকলেই ভোগ করে। তাছাড়া তিনি শুধু ইহকালের মালিক নয়, বরং তিনি পরকালেরও মালিক। কিয়ামত, হাশর, মিয়ান, জন্মাত-জাহান্নাম সবকিছুই তাঁর অধীন। শেষ বিচারের দিনে তিনিই একমাত্র বিচারক। তিনিই নিজ ক্ষমতায় পুণ্যবানদের পুরস্কার ও পাপীদের শাস্তি দেবেন। সুতরাং সকল প্রশংসা ও ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। এতে তাঁর কোনো অংশীদার নেই।

এই সূরার প্রথম তিন আয়াতে আদ্বাহ তা'য়ালার সীমাহীন কুদরত ও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে এবং মধ্যবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষ শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই নিকট সাহায্য চাইবে। কেননা তিনিই ইবাদতের যোগ্য। আর তিনি ব্যতীত সাহায্যকারী কেউ নেই।

এ সূরার শেষ তিন আয়াতে আদ্বাহ তা'য়ালার নিকট মানুষের প্রার্থনা ও মুনাজাত বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু মহান আদ্বাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং নিয়ন্ত্রক। সুতরাং সঠিক পথ একমাত্র তিনিই দেখাতে পারেন। তিনিই ভালো জানেন কোন পথ সঠিক আর কোন পথ ভ্রান্ত। অতএব মানুষের উচিত তাঁর নিকট সত্যপথের সন্ধান প্রার্থনা করা। যে পথ আদ্বাহর প্রিয় বাদ্দাগণ, নবি-রাসূলগণ অনুসরণ করেছেন সে পথ প্রদর্শনের জন্য আদ্বাহর নিকট মুনাজাত করা। আর যে পথে অভিশপ্ত, পথভ্রষ্টরা পরিচালিত হয়েছে সে পথ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা।

নৈতিক শিক্ষা

আদ্বাহ তা'য়ালার একক, অধিতীয় ও সকল কিছুই মালিক। বিশ্বজগতের সকল প্রশংসা তাঁরই গ্রাণ্য। তিনিই মানুষকে সরল সঠিক পথের সন্ধান দেন। সুতরাং আমরা সকাল সন্ধ্যায় তাঁর প্রশংসা করব। সবসময় তাঁর ইবাদত করব। আর আমাদের সকল সঠিক পথের সন্ধান দানের জন্য তাঁর নিকটই প্রার্থনা জানাব। সাথে সাথে পথভ্রষ্ট ও অন্যায়কারীদের আচরণ অনুসরণ থেকে আমরা বিরত থাকব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা পাশের বন্ধুকে সূরা ফাতিহা অর্থসহ শোনাবে।

পাঠ ৬

সূরা আন-নাস (سُورَةُ النَّاسِ)

আল-কুরআনের সর্বশেষ সূরা হচ্ছে সূরা আন-নাস। এটি পবিত্র কুরআনের ১১৪তম সূরা। এ সূরাটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়। এর আয়াত সংখ্যা ৬টি।

এ সূরায় اَللّٰهُ (আন-নাস) শব্দটি মোট পাঁচবার ব্যবহৃত হয়েছে। সূরায় ব্যবহৃত এ اَللّٰهُ শব্দ থেকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। সূরা আল-ফাতিহায় আদ্বাহ তা'য়ালার প্রশংসা করা হয়েছে। তারপর তাঁর নিকট সরল পথের সন্ধান চাওয়া হয়েছে। অতঃপর কুরআনের অন্যান্য সূরায় মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু শয়তান মানুষকে সঠিকপথ থেকে বিরত রাখতে চায়। তাই সবশেষে এ সূরায় আদ্বাহ পাকের নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়। এভাবে কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে।

শব্দার্থ

قُلْ	- আপনি বলুন; তুমি বল	فَرَّ	- অনিষ্ট, ক্ষতি
أَعُوذُ	- আমি আশ্রয় চাই, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমি শরণ নেই	أَلْوَسْوَايَ	- কুমন্ত্রণাদাতা
رَبِّ	- রব, প্রতিপালক	أَلْحَايَ	- আত্মপোষনকারী (শয়তান)
النَّاسِ	- মানুষ, মানবজাতি	يُؤَسِّسُ	- সে কুমন্ত্রণা দেয়
مَلِكِ	- মালিক, অধিপতি	صُدُورِ	- বক্ষসমূহ, অন্তরসমূহ
إِلَهِ	- মাবুদ, উপাস্য	الْجَنَّةِ	- জিন

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

১. আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রতিপালকের নিকট।

مَلِكِ النَّاسِ

২. মানুষের অধিপতির নিকট।

إِلَهِ النَّاسِ

৩. মানুষের ইলাহ এর নিকট।

وَنَفَرَ أَلْوَسْوَايَ الْخَنَّاسِ

৪. আত্মপোষনকারী কুমন্ত্রণাদাতা (শয়তান)-এর অনিষ্ট থেকে।

الَّذِي يُؤَسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

৫. যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

وَمِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ

৬. জিন এবং মানুষের মধ্য থেকে।

ব্যাখ্যা

সূরা আন-নাস এর আয়াতসমূহে দুই প্রকারের আলোচনা রয়েছে। প্রথম তিন আয়াতে মহান আল্লাহর তিনটি গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো রব, মালিক ও ইলাহ। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালাই মানুষের রব, মালিক ও ইলাহ। তিনি ব্যতীত আর কেউ এ তিনটি গুণের অধিকারী নয়। মানুষ হলো তাঁর বান্দা। সুতরাং মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় আল্লাহর দিকে ক্বিরে যাওয়া। এভাবে সূরার প্রথম অংশে আল্লাহ তা'য়ালার তিনটি গুণের উল্লেখ করে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

সূরার দ্বিতীয় অংশে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহান আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা হয়েছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুষমন। সে গোপনে, প্রকাশ্যে, ঘুমন্ত অবস্থায়, জাগ্রত অবস্থায় সবসময় মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। তার কাজই হলো কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষের অন্তরকে বিপথগামী করা। মানুষ যেন আল্লাহ তা'য়ালাকে ভুলে যায়, তাঁর ইবাদত না করে ইত্যাদি কুমন্ত্রণা শয়তান দিয়ে থাকে। শয়তান শুধু জিনই নয় বরং মানুষের মধ্যেও শয়তান রয়েছে। মানুষ শয়তানও অন্যকে প্রভাবিত করে, দীন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। এসব শয়তান থেকে আল্লাহ তা'য়ালার আশ্রয় ব্যতীত বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এ জন্যে এ সূরায় শয়তানের সকল কুমন্ত্রণা ও অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তা'য়ালার আমাদের প্রতিপালক। তিনিই আমাদের মাবুদ। আমাদের সকল কিছুই তাঁর দান। তিনিই সমগ্র বিশ্বজগতের প্রকৃত অধিপতি। সুতরাং তাঁর আদেশ-নিষেধ আমরা সবসময় মেনে চলব। আর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকব। কেননা শয়তান মানুষকে অন্যায়, অনৈতিক ও অশ্লীল কাজের দিকে পরিচালনা করে।

ফলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকতে পারলে অনৈতিক কাজ থেকেও বেঁচে থাকা যাবে।

কাজ : শিক্ষার্থী পাশের বন্ধুকে সূরা আন-নাসের অর্থ ও নৈতিক শিক্ষা শোনাবে।

সূরা আল-ফালাক (سُورَةُ الْفَلَكِ)

সূরা আল-ফালাক আল-কুরআনের ১১৩তম সূরা। এটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। এ সূরার প্রথম আয়াতের শেষ শব্দ হলো الْفَلَكِ (ফালাক)। এ শব্দ থেকেই এ সূরার নাম সূরা আল-ফালাক রাখা হয়েছে।

সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন নাস এর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ সূরা দুটিতে বিভিন্ন জিনিসের অনিষ্ট থেকে আত্মা তঁরালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। এ সূরা দুটি নাথিলের কারণ নিম্নরূপ:

একবার লাবীদ ইবনে আসিম নামক এক ইয়াহুদি রাসুলুদ্দাহ (স.) উপর জাদু করে। এ কাজে সে তার কন্যাদের সাহায্য নেয়। তারা গোপনে রাসুল (স.)-এর একটি পবিত্র চুল সংগ্রহ করে এবং তাতে এগারটি গিরা দিয়ে জাদু করে। ফলে রাসুল (স.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। জাদুর কারণে রাসুলুদ্দাহ (স.)-এর কষ্ট হতে থাকে। এমতাবস্থায় আত্মা তঁরালার এ সূরা দুটি নাথিল করেন। এ সূরা দুটিতে মোট ১১টি আয়াত রয়েছে। প্রতিটি আয়াত পড়ে প্রতিটি গিরাতে ফুক দিলে জাদুর প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। রাসুল (স.) সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

শব্দার্থ

الْفَلَكِ	- প্রভাত, উষা	وَقَبْ	- গভীর হলো, আচ্ছন্ন হলো
وَنَ	- হতে, থেকে	الْفُكْ	- ফুক দানকারী নারীগণ,
عَلَّقَى	- তিনি সৃষ্টি করেছেন	الْفُكْ	- গ্রহিসমূহ, গিরাসমূহ
عَالِي	- রাতের অন্ধকার	عَالِي	- হিংসাকারী, হিংসুক
يَا	- যখন	عَسَ	- সে হিংসা করল

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقَلْبِ

১. বুলন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি প্রভাতের স্রষ্টার নিকট।

وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

২. তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে।

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

৩. রাতের আধারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা গভীর হয়।

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

৪. এবং অনিষ্ট থেকে ঐ সমস্ত নারীসের, যারা গ্রহিতে ফুৎকার দেয়।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

৫. এবং হিংস্কের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।

ব্যাখ্যা

এ সূরায় আত্মাহ তা'য়ালার নিকট অনিষ্টকর বস্তু থেকে আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এর প্রথম আয়াতে উম্মার রব আত্মাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে। মূলত আত্মাহ পাক সকল শক্তির উৎস। বিশ্বজগতের সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে রূপান্তর করেন। তিনিই সকাল, সন্ধ্যা, উষা ইত্যাদির আগমন ঘটান। সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে তিনিই রক্ষা করেন। এজন্যে সূরার প্রথমেই আত্মাহ তা'য়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

এর পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে। আত্মাহ তা'য়ালার পৃথিবীর সবকিছুরই স্রষ্টা। এসব সৃষ্টির মধ্যে অনেক হিত্র, বিদ্বান্ড ও অনিষ্টকর সৃষ্টিও রয়েছে। এগুলো মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। এগুলোর অনিষ্ট থেকে রক্ষাকর্তা হলেন মহান আত্মাহ। গভীর রাতে নানারূপ বিপদাপদ ঘটতে পারে। যেমন- জিন, শয়তান, চোর-ডাকাত, শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি। এসবের অনিষ্ট থেকেও রক্ষাকর্তা মহান আত্মাহ। তাছাড়া জাদুকর নর-নারী ও হিংস্কের হিংসা থেকে আশ্রয়দাতাও আত্মাহ তা'য়ালার। আয়াতগুলোতে উল্লিখিত সমুদয় বিষয় থেকে আত্মাহ তা'য়ালার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

নৈতিক শিক্ষা

আল্লাহ তা'য়ালার আমাদের প্রভু। তিনিই সকল কিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। সুতরাং সকল বিপদে আপদে আমরা তাঁরই নিকট সাহায্য চাইব। সব ধরনের অনিষ্ট থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করব। সাথে সাথে হিংসা, জাদু-টোনা, অপরের ক্ষতিসাধন ইত্যাদি কাজ থেকে আমরা নিজেরা বিরত থাকব।

পাঠ ৮

সূরা আল-হুমায়্যাহ (سُورَةُ الْهُمَزَةِ)

সূরা আল-হুমায়্যাহ আল কুরআনের ১০৪ তম সূরা। এ সূরাটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এর আয়াত সংখ্যা ৯টি। এ সূরার প্রথম আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হুমায়্যাহ অনুসারে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। আমরা এ সূরাটি অর্থসহ মুখস্থ করব এবং এ সূরার শিক্ষা অনুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

وَنَلَّ	- দুর্তোগ, ধ্বংস	كَلَّ	- কখনো নয়
كُلَّ	- প্রত্যেক, সকল	لَيْلَيْكَ	- অবশ্যই সে নিশ্চিত হবে
مُرَّ	- পশ্চাতে নিন্দাকারী	الْمَطْنَةِ	- হত্যা, একটি আহল্লামের নাম
لَمُرَّ	- সম্মুখে নিন্দাকারী	مَا أَقْرَبَكَ	- আপনি কি জানেন?
مَجَّ	- সে জমা বা একত্র করেছে, সে সম্বল করেছে।	قَرَّ	- আশ্রয়
مَالًا	- মাল, ধন-সম্পদ	تَكَلَّلَ	- তা গ্রাস করবে
عَدَّدَ	- সে বারবার গণনা করেছে	الْأَقْيَدَ	- জয়সমূহ, অন্তরসমূহ
يَحْسِبُ	- সে ধারণা করে, সে হিসাব করে।	مُؤَصَّدَ	- পরিবেষ্টিত
الْمَلَكَةَ	- তা অমর করেছে, তা ডিরঙ্গারী করেছে।	عَدُوَّ	- শত্রু সমূহ, ঝুঁটি সমূহ
		مُتَّعِدَ	- দীর্ঘায়িত, প্রলম্বিত।

অনুবাদ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَنُذِيعُ لَكُمْ هُزُونَ لَمَزَةٍ

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পেছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে।

الَّذِي يَجْعَلُ مَا لَا وَعَدَهُ

২. যে অর্থ জমায় ও তা বারবার গণনা করে।

يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

كَلَّا لَيُنْصَبَنَّ فِي الْخَطِيئَةِ

৪. কখনও না; সে অবশ্যই হতামায় নিক্ষিপ্ত হবে।

وَمَا آخِرُكَ مَا الْخَطِيئَةُ

৫. আর আপনি কি জানেন, হতামা কী?

كَلَّا اللَّهُ الْمُنُوقَدَةُ

৬. এটি আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন।

الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْوِدَةِ

৭. যা অন্তরসমূহ গ্রাস করবে।

إِنَّمَا عَالَمُهُمْ مُؤَصَّدَةٌ

৮. নিশ্চয়ই এটি তাদের পরিবেষ্টন করে রাখবে।

فِي عَنَبٍ مُّجْتَدَدَةٍ

৯. দীর্ঘায়িত শুষ্কসমূহে।

শানে মুহুল

উমাইয়া ইবন খালফ, ওলীদ ইবন মুসিরা ও আখনাস ইবন সরাযক মহানবি (স.) ও মুমিনদের শিবত করত এবং তাদের অধিকাংশ ছিল প্রবল। তাদের এই অপকর্মের ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে মহান আল্লাহ এই সূরা অবতীর্ণ করেন।

ব্যাখ্যা

সূরা অল-হুমায়াকহে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম তিন আয়াত নিয়ে প্রথম অংশ এবং শেষ ছয়টি আয়াত নিয়ে দ্বিতীয় অংশ। প্রথম অংশে তিনটি জঘন্য গুনাহের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে এসব গুনাহের শাস্তির কথা বলা হয়েছে।

এ সূরায় বর্ণিত স্তন্যাহ বা পাপকাজগুলো হলো-

ক. পশ্চাতে বা গোপনে কারো নিন্দা করা। একে গিবতও বলা হয়। এটি অত্যন্ত খারাপ কাজ। আল্লাহ তা'য়ালার আল-কুরআনের অন্য আয়াতে গিবত করা মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সমান বলে উল্লেখ করেছেন।

খ. সামান্যামনি কারো নিন্দা করা। গোপনে নিন্দা করার মত এটাও অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর ফলে মানুষ অপমানিত হয়। অনেক সময় মানুষের মধ্যে ঝগড়া-ফাসাদ ও মারামারির সৃষ্টি হয়।

গ. ধন-সম্পদ জমা করা ও বারবার তা গণনা করা। একে এককথায় অর্থলীলা বা আরের লোভ বলা যায়। ধন-সম্পদের প্রতি লোভী হলে মানুষ নানা অবৈধ পথে উপার্জন করতে থাকে। সে কৃপণ হয়ে পড়ে। গরিব-দুখীদের অধিকার আদায় করে না। যাকাত, হজ ইত্যাদি ফরজ ইবাদতও পালন করে না। বরং সে সম্পদ জমা করতে থাকে এবং ধারণা করে যে, এসব ধন-সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে।

এ সূরার দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত তিনটি জঘন্য কাজের শাস্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। গিবত, পরনিন্দা ও অর্থলীলা তিনটিই খারাপ কাজ। এগুলো কবির স্তন্যাহ। এ জন্য আবিরাতে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে। অর্থ মানুষকে অমর করে রাখবে এ ধারণাও ঠিক নয়। বরং সকল মানুষকেই মরতে হবে। তারপর হাশরের ময়দানে আল্লাহ তা'য়ালার প্রত্যেকের হিসাব নেবেন। যারা দুনিয়াতে এ তিনটি জঘন্য কাজ করে আবিরাতে তাদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাদের স্থান হবে হতামাহ নামক জাহান্নামে। হতামার আগুনে ঐ সকল ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জ্বলবে। এমনকি তাদের হৃদয় বা অন্তরও ঐ আগুনে পুড়বে। কোনো কিছুই আগুনের গ্রাস থেকে রেহাই পাবে না।

নৈতিক শিক্ষা

সূরা আল হুম্বাহ এর নৈতিক শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তিনটি মারাজ স্তন্যাহের বা পাপকাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হলো গিবত তথা পশ্চাতে বা গোপনে কারো নিন্দা করা, সামান্যামনি নিন্দা করা ও অর্থলীলা। এ তিনটিই নীতিহীন কাজ, অনৈতিক কাজ। উত্তম চরিত্রবান লোক এসব কাজ করতে পারে না। বরং নীতিবান হতে হলে এসব দোষ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। অতএব, আমরাও এসব দোষ থেকে বেঁচে থাকব। কখনো কারো নিন্দা করব না। আর অর্থের প্রতি লোভ করব না। বরং আল্লাহ তা'য়ালার যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকব এবং প্রয়োজনমতো তা খরচ করব।

পাঠ ৯ সূরা আল-আসর (سُورَةُ الْاَسْرِ)

সূরা আল-আসর আল-কুরআনের ১০৩ তম সূরা। এটি মক্কা শরিফে অবতীর্ণ। এর আয়াত সংখ্যা মাত্র ৩টি। এ সূরার প্রথমে আল্লাহ তা'আলা আসর বা মহাকালের শপথ করেছেন। এজন্যে এ সূরার নাম রাখা হয়েছে আল-আসর। পবিত্র কুরআনের ছোট সূরাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। তবে এ সূরার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, 'যদি মানুষ কেবল এ সূরাটি নিয়ে চিন্তা করত, তবে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল' (ইবনে কাসির)। অর্থাৎ এ সূরার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝতে পারলে মানুষ দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণের পথ লাভ করত। সুতরাং আমরা এ সূরাটি অর্থসহ শিখব। অতঃপর এর তাৎপর্য শিখা করব এবং তদনুযায়ী আমল করব।

শব্দার্থ

وَ	- শপথ, কসম।	الَّذِينَ	- যারা
الْعَصْرِ	- সময়, যুগ, কাল, মহাকাল।	آمَنُوا	- তারা ইমান এনেছে।
إِنَّ	- নিশ্চয়ই, অবশ্যই	وَعَمِلُوا	- তারা আমল করেছে।
الْإِنْسَانَ	- মানুষ	الصَّالِحَاتِ	- সৎকর্মসমূহ।
خُسْرٍ	- ক্ষতি।	وَتَوَاصَوْا	- তারা পরস্পরকে উপদেশ দিয়েছে।
إِلَّا	- ব্যতীত, ছাড়া	الْحَقِّ	- সত্য।
		الصَّبْرِ	- ধৈর্য।

অনুবাদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে।

وَالْعَصْرِ

১. মহাকালের শপথ।

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خَاسِرٌ

২. নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

৩. কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

শানে নুহুল

ওলীদ ইবন মুগিরা, 'আস ইবন ওয়াইল, আসওয়াদ ইবন মুত্তালিব প্রমুখ মুশরিক বলত যে, মুহাম্মদ (স.) অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে (তাদের কথার অসারতা প্রমাণ করে) আল্লাহ তা'আলা সূরাটি নাখিল করেন।

ব্যাখ্যা

সূরা আল-আসরের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ তা'আলা সময় বা মহাকালের শপথ করেছেন। মানুষের জীবনে সময় অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এ সময়ের মধ্যেই মানুষকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। সুতরাং সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। যারা দুনিয়াতে সময়ের সদ্ব্যবহার করবে এবং নেক আমল করবে পরকালে তারাও সফলতা লাভ করবে। তাই সময়ের শপথ করে মহান আল্লাহ মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই মানবজাতি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে না, আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ মেনে চলে না। যারা একদম মনগড়াভাবে জীবনযাপন করবে তারা সবাই ক্ষতিগ্রস্ত।

তৃতীয় ও শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য চারটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ মানব জাতির মধ্যে যারা এ চারটি কাজ করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরং তারা সফলতা লাভ করবে। আর যারা দুনিয়াতে এ কাজগুলো করবে না তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এ কাজগুলো হলো ইমান আনা, সৎকর্ম করা, সত্যের উপদেশ দেওয়া ও ঘৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া।

এ কাজগুলোর প্রথম দুটি কাজ ব্যক্তিগত। অর্থাৎ প্রথমে ইমান আনতে হবে। তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এরপর দ্বিতীয় কাজ হলো ভালো কাজ করা। আল্লাহ তা'আলা যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন তা পালন করতে হবে। আর তিনি যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার অনুগত্য করার নামই নেক কাজ।

চারটি কাজের মধ্যে শেষের কাজ দুটি সামাজিক। অর্থাৎ একা একা এ কাজ দুটি করা যাবে না। এর প্রথমটি হলো- সমাজের মানুষকে সত্যের উপদেশ দেওয়া। অর্থাৎ মানুষকে সত্যপন্থের দিকে ডাকা। তাদের নেক কাজে উৎসাহিত করা, অন্যায় কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা ইত্যাদি। সামাজিক দায়িত্বের শেষটি হলো মানুষকে ঘৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া। বিপদ-আপদ, দুর্ভিক্ষ-কষ্ট আল্লাহ তা'আলারই দান। এগুলোর মাধ্যমে তিনি মানুষকে পরীক্ষা করেন। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে হতাশ ও নিরাশ হওয়া যাবে না। বরং ঘৈর্যধারণ করতে হবে এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। এভাবে পরস্পরকে ঘৈর্যধারণের উপদেশ দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

নৈতিক শিক্ষা

আমরা সবাই সফলতা লাভ করতে চাই। কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হতে চাই না। সুতরাং আমরা ইমান আনব এবং নেক কাজ করব। কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার ও অনৈতিক কাজ করব না। সাথে সাথে আমরা আমাদের বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী সবাইকে সত্য ও সুন্দরের দিকে আহ্বান করব। সবাইকে উত্তম চরিত্রবান ও নীতিবান হতে উৎসাহ দেব। বিশদে আপদে ধৈর্যধারণ করব। হতাশ হয়ে কখনো অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করব না।

কাজ : ক্লাসের সব শিক্ষার্থী দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল সূরা আসর অর্থসহ মুখস্থ বলবে। অন্যদল এ সূরার ব্যাখ্যা ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে বলবে। একইভাবে দ্বিতীয় দল প্রথম কাজটি এবং প্রথম দল পরের কাজটি করবে।

পাঠ ১০

অর্থসহ মুনাযাতের তিনটি আয়াত

পৃথিবীতে চলার জন্যে আমাদের নানা জিনিসের প্রয়োজন। এসব জিনিস পাওয়ার জন্য আমরা বহু কষ্ট করি। আল্লাহ তা'আলার দয়া ব্যতীত কোনো কিছুই আমরা লাভ করতে পারি না। মহান আল্লাহ আমাদের রব। তিনিই সবকিছু আমাদের দান করেন। দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ তা'আলারই দান। সুতরাং কোনো কিছু পাওয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকটই প্রার্থনা করা উচিত। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনাকেই মুনাযাত বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং আমাদের মুনাযাত করার জন্যে শিক্ষা দিয়েছেন। আল-কুরআনে মুনাযাতমূলক বহু আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র তিনটি আয়াত নিয়ে উল্লেখ করা হলো। আমরা এসব আয়াত শিখব ও অর্থ জানিব। এরপর এগুলোর মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করব।

আয়াত ১

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও। আর আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। (সূরা আল-বাকার : ২০১)

দুনিয়ার জীবনই মানুষের শেষ নয়। এরপর রয়েছে আখিরাত। আখিরাত হলো চিরস্থায়ী। এর শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। এ দুটি জীবনে কল্যাণ লাভ করাই হলো প্রকৃত সফলতা। দুনিয়ার জীবনে আমরা সুখ-শান্তি চাই। আর আখিরাতে চাই মুক্তি ও সফলতা। পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া হলো সবচেয়ে বড় সফলতা। আল্লাহ তা'আলার হাতেই রয়েছে এ সমস্ত কল্যাণ ও সফলতা। আল্লাহ তা'আলা এগুলো মানুষকে দান করেন। এজন্য আমরা তাঁর কাছেই প্রার্থনা জানাব। উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ শিক্ষাই প্রদান করেছেন। দুনিয়া ও আখিরাতের সমস্ত কল্যাণ লাভের জন্য এ দোয়াটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আয়াত ২

رَبِّ اَرْحَمُهُمَا كَمَا رَزَيْتَنِي صَغِيرًا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর। যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

মাতাপিতা সন্তানের অতি আপনজন। তাঁরা অত্যন্ত আদর-স্নেহে সন্তানকে লালন-পালন করেন। নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ান। নিজেরা কষ্ট করে সন্তানকে আরাম-আয়েশে রাখেন। বিশেষ করে শৈশবকালে তাঁরা আমাদের খুব হৃদয়ের সাথে প্রতিপালন করেন। শিশুকালে সকল মানুষই অসহায় থাকে। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না, খেতে পারে না, চলাফেরা করতে পারে না। এমনকি কথাবার্তাও বলতে পারে না। মাতাপিতাই এ সময় মানুষের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। তাঁরাই এ সময় সন্তানকে মায়্যা-মমতা দিয়ে বড় করে তোলেন। অতএব আমাদের সকলের কর্তব্য মাতাপিতার অনুগত্য করা। তাঁদের কথা মেনে চলা। তাঁদের জন্য আত্মাহুতা'য়ালার নিকট দোয়া করা। এ আয়াতে মহান আত্মাহুতা'য়ালার জন্যে দোয়া করার বাক্য শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এ আয়াত অর্থসহ শিখব। অতঃপর আন্তরিকভাবে এ আয়াত পড়ে মহান আত্মাহুতা'য়ালার নিকট আমাদের মাতা-পিতার জন্যে দোয়া করব। তাহলে আত্মাহুতা'য়ালার তাঁদের কল্যাণ ও রহমত দান করবেন।

আয়াত ৩

رَبِّ رَزَيْتَنِي وَلِيًّا

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জানে সমৃদ্ধ কর। (সূরা ত্ব-হা : ১১৪)

উক্ত আয়াতে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য মুনাজাত করার কথা বলা হয়েছে। জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। কেননা শিক্ষা ও জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা আত্মাহুতা'য়ালাকে চিনতে পারি। তাঁর বিধান ও বাণী জানতে পারি। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে আমরা মানুষের মত মানুষ হই। জীবনে উন্নতি লাভের জন্যও জ্ঞানার্জন করা জরুরি। সুতরাং আমরা ভাষণে করে লেখাপড়া শিখব। জ্ঞানার্জনে কোনোপ্রাপ্তি অবহেলা করব না। আর সাথে সাথে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে দেওয়ার জন্য আত্মাহুতা'য়ালার নিকট মুনাজাত করব। কেননা মহান আত্মাহুতা'য়ালাই সবকিছুর মালিক। তিনিই মানুষকে জ্ঞান দান করেন। অতএব জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তাঁর নিকটই প্রার্থনা করতে হবে।

কাজ : শিক্ষার্থীরা সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে মুনাজাতমূলক আয়াত তিনটি অর্থসহ মুখস্থ বলবে।

পাঠ ১১ আল্ হাদিস (الْحَدِيثُ)

হাদিস (الْحَدِيثُ) আরবি শব্দ। এর অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণী, কাজ ও অনুমোদনকে হাদিস বলা হয়। অর্থাৎ আমাদের প্রিয়নবি (স.) যা কিছু বলতেন তা-ই হাদিস। তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন তাও হাদিস। আর যে সমস্ত কাজ সাহাবিগণ তাঁর সামনে করেছেন কিছু তিনি তাঁদের নিষেধ করেন নি বরং ঐ সমস্ত কাজে মৌনসম্মতি দিয়েছেন এগুলোও হাদিস। হাদিসের অপর নাম হলো সুন্নাহ।

সাহাবিগণ রাসূল (স.)-এর সবরকম হাদিসই সংরক্ষণ করতেন। রাসূল (স.) কিছু বললে সাথে সাথে তাঁরা তা মুখস্থ করতেন। নবি কারিম (স.) যে কাজ যেভাবে করতেন সাহাবিগণও তা ঠিক তেমনিভাবে আদায় করতেন। অতঃপর নিজ পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট এগুলো শৌছে দিতেন। এভাবে মহানবি (স.)-এর জীবদ্দশায় হাদিস সংরক্ষণ করা হয়। নবি করিম (স.)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবিগণ মজলিস করে হাদিস শিক্ষা দিতেন। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন তাঁদের নিকট হাদিস শিখতে আসতেন। পরবর্তীতে মুহাম্মদিসগণ রাসূলুল্লাহ (স.)-এর সকল হাদিস লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তাঁরা হাদিসের বহু কিতাব সংকলন করেন। এভাবে আমরাও নবি করিম (স.)-এর হাদিস লাভ করি।

হাদিসের গুরুত্ব

ইসলামে হাদিসের স্থান অত্যন্ত উর্ধ্বে। ইসলামি জীবনব্যবস্থার দ্বিতীয় উৎস হলো হাদিস। আর এর প্রথম উৎস হলো আল-কুরআন। সুতরাং ইসলামে আল-কুরআনের পরই হাদিসের স্থান। হাদিস হলো আল-কুরআনের ব্যাখ্যাধিকরণ। আল-কুরআনে আদ্বাহ তা'য়ালার মানুষকে নানা নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর নবি করিম (স.) হাদিসের মাধ্যমে তা মানুষের নিকট বিশ্লেষণ করেছেন। নিচের উদাহরণটি পড়লে আমরা স্পষ্টভাবে বিষয়টি বুঝতে পারব। যেমন- আল-কুরআনে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কীভাবে আমরা সালাত আদায় করব তা বলে দেওয়া হয় নি। একাকী পড়ব না-কি সকলে মিলে পড়ব, কত রাকআত পড়ব, কোন সময় পড়ব, কত-সিজদা কীভাবে করব ইত্যাদি কিছুই কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। এগুলো আমরা হাদিসের মাধ্যমে পাই। রাসূলুল্লাহ (স.) এসব নিয়ম-কানুন আমাদের বলে দিয়েছেন। তিনি নিজে সালাত আদায় করে আমাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স.)-এর হাদিস না থাকলে আমরা তা কখনোই জানতে পারতাম না। সুতরাং কুরআনের পরই হাদিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন আদ্বাহ তা'য়ালার প্রেরিত রাসূল। তিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য আদর্শ। তাঁর মাধ্যমেই আমরা আদ্বাহ তা'য়ালার পরিচয় লাভ করি। তিনি আদ্বাহ তা'য়ালার নির্দেশেই আমাদের সংগণ প্রদর্শন করেছেন। তিনি মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতেন। মন্দকাজ থেকে বিরত থাকতে বলতেন। তাঁর এসব আদেশ-নিষেধই হলো হাদিস।

পবিত্র হাদিস আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহান আদ্বাহ বলেছেন, 'রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর। আর যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।' (সূরা আল-হাশর : ৭)

অতএব, রাসূল (স.)-এর হাদিস আমরা পাঠ করব। তার অর্থ বুঝব এবং সে অনুযায়ী আমল করব। তাঁর আদেশগুলো মেনে চলব এবং নিষেধগুলো থেকে বিরত থাকব।

অর্থসহ নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক দু'টি হাদিস

নীতি ও নৈতিকতা মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য। নীতি হলো কথার ও কাজে সং, সুন্দর ও মার্জিত হওয়া। কোনোরূপ অন্যায়, অত্যাচার ও অশাশীন কাজ-কর্ম না করা। নীতিহীন মানুষ পতন সমান। যে ব্যক্তি চলাফেরা ও কথাবার্তায় নীতির অনুসরণ করে না, সমাজের সকলে তাকে ঘৃণা করে। অন্যদিকে নীতিবান মানুষকে সবাই ভালোবাসে। সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সর্বোত্তম নীতির অধিকারী। তিনি সর্বদা নীতি ও আদর্শের অনুশীলন করতেন। উত্তম চরিত্র ও নীতির জন্যে শত্রুরাও তাঁর প্রশংসা করত।

হাদিসসমূহে আমরা দেখতে পাই মহানবি (স.) উন্মত্তগণকেও নীতি-নৈতিকতা শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে দুটি নীতিমূলক হাদিস উল্লেখ করা হলো। আমরা এগুলো মুখস্থ করব, এর অর্থ জানব। আমরা এ নীতিমূলক হাদিস অনুযায়ী আমল করব।

হাদিস ১

لَا يَتَيْنِ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (مسند ديلمي)

অর্থ: যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পালন করে না তার কোনো দীন নেই অর্থাৎ সে প্রকৃত দীনদার নয়। (মুসনায়ে দায়লামি)

শিক্ষা

অঙ্গীকার পালন করা নীতি-নৈতিকতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমরা নানা সময় নানারূপ গুয়াদা ও অঙ্গীকার করে থাকি। এসব অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে মানুষের মধ্যে অবিश्वास সৃষ্টি হয়। পরস্পর মারামারি ও অশান্তির জন্ম হয়। সুতরাং সামাজিক শান্তির জন্যে অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যিক। ইসলামে অঙ্গীকার রক্ষা করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মহানবি (স.) নিজে সর্বদা অঙ্গীকার রক্ষা করে চলতেন। অঙ্গীকার ভঙ্গ করা প্রকৃত দীনদার ব্যক্তির লক্ষণ নয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ দীনদার সে সবসময় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেবে। সে কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। অতএব, আমরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করব না। বরং জীবনের সকল প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা প্রকৃত দীনদার হতে পারব।

হাদিস ২

وَالْكَذِبُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ (متفق عليه)

অর্থ: তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা (মানুষকে) পাপের দিকে নিয়ে যায়। আর পাপ জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছে দেয়। (বুখারি ও মুসলিম)

শিক্ষা

মিথ্যা হলো সত্যের বিপরীত। প্রকৃত কথা, কাজ, বিষয়, অবস্থা ইত্যাদি গোপন করাকে মিথ্যা বলা হয়। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ তাকে ভালোবাসে না। মিথ্যাবাদীকে কেউ সাহায্য সহযোগিতাও করে না। মহানবি (স.) ছিলেন চরম সত্যবাদী। তিনি জীবনে কোনোদিন মিথ্যা কথা বলেন নি। তিনি মানুষকে সত্য কথা বলার জন্যে

নির্দেশ দিয়েছেন এবং মানুষকে মিথ্যা ত্যাগ করতে বলেছেন। কেননা মিথ্যা হলো সকল পাপের মূল। মিথ্যা মানুষকে পাপের নিকে নিয়ে যায়। কোনো পাপ কাজ করে মিথ্যা বললে অনেক সময় তা ধরা যায় না। ফলে মানুষ পুনরায় পাপ করতে থাকে। কিন্তু আত্মাহ তা'হালা সবকিছু দেখেন ও জানেন। তাঁর নিকট মিথ্যা বলা যায় না। বরং দুনিয়ার সব পাপের তিনি হিসাব রাখেন। হাশরের ময়দানে তিনি এ সবার বিচার করেন।

যেহেতু মিথ্যা মানুষকে পাপের নিকে নিয়ে যায়। আর পাপের শাস্তি হলো জাহান্নাম। সুতরাং আমরা মিথ্যা বলা পরিহার করব। সর্বদা সত্যকথা বলব। তাহলে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা পাব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা দুই দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল নৈতিক গুণাবলি বিষয়ক হাদিস দু'টি অর্ধসহ মুখস্থ বলবে। অন্যদল হাদিস দু'টির শিক্ষা সম্পর্কে বলবে। আবার প্রথম দল উক্ত হাদিসের শিক্ষা এবং বিত্তীয় দল হাদিস দুইটি অর্ধসহ মুখস্থ বলবে।

পাঠ ১৩

অর্ধসহ মুনাজাতমূলক দু'টি হাদিস

মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন মানবজাতির মহান শিক্ষক। তিনি মানুষকে সবধরনের কল্যাণের পথে পরিচালনা করতেন। মানুষ কীভাবে চললে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করবে তাও তিনি দেখিয়ে গেছেন। উম্মতের কল্যাণের জন্য তিনি বহু মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন। এসব মুনাজাত হাদিস শরিকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিম্নে মুনাজাতমূলক দু'টি হাদিস উল্লেখ করা হলো। আমরা এ হাদিস দু'টি অর্ধসহ মুখস্থ করব এবং এগুলোর দ্বারা আত্মাহ তা'হালায় নিকট মুনাজাত করব।

হাদিস ১

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَعَظِيمِي (طبرانی)

অর্থ: হে আত্মাহ! আমার পাপসমূহ, জুল-ঐতিগুলো এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। (তবারানি)

আমরা কথাবার্তা, চলাফেরায় নানারূপ পাপ কাজ করে ফেলি। ছোট-বড়, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত এসব পাপ আখিরাতে আমাদের শাস্তির কারণ হবে। অতএব এগুলো থেকে আত্মাহ তা'হালায় নিকট ক্ষমা চাওয়া দরকার। কেননা মহান আত্মাহই একমাত্র ক্ষমা করার মালিক। সুতরাং আমরা সবসময় এ হাদিসের মাধ্যমে জুলজ্বলটি ও পাপের জন্য আত্মাহর নিকট ক্ষমা চাইব।

হাদিস ২

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا تَأْمُرُ بِرُقَاظِنَا (ابن ماجه)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উপকারী বিদ্যা এবং পবিত্র (হালাল) রিযিক চাই। (ইবনে মাজাহ) খাদ্য ও জ্ঞান মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে হালাল ও পবিত্র খাদ্য গ্রহণ করার জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর উপকারী বিদ্যা অর্জন করাও জরুরি। এ উভয় জিনিসের জন্যেই মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। এ হাদিসের মাধ্যমে প্রিয়নবি (স.) আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ দুটি জিনিসের জন্যেই প্রার্থনা করার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন। আমরা এ দোয়াটি মুখস্থ করব ও এর মাধ্যমে মুনাজাত করব।

কাজ : শিক্ষার্থী উভয় হাত তুলে নিজেদের মস্তকের জন্য প্রার্থনা করবে এবং প্রার্থনায় পাঠের হাদিস ২টি অর্থসহ বলবে।

পাঠ ১৪

নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় হাদিস

জীবনের সকল ক্ষেত্রে মনুষ্যত্ব ও নীতি-আদর্শের শিক্ষাকে ধরে রাখার চেষ্টা ও চেষ্টানাই হলো নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ। আদর্শ সমাজ গঠনের জন্যে এ মূল্যবোধের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ মানুষকে উত্তম চরিত্রবান করে গড়ে তোলে। ফলে মানুষ সমাজে সন্ধান ও মর্যাদা লাভ করে। সকলে এ আদর্শ অনুশীলন করলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যান্যকে সমাজে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ না থাকলে সমাজে শান্তি থাকে না। দুর্নীতি, সহ্যাস, চুরি-ডাকাতি, হিনতাই, প্রভাবণা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে দয়া, মায়্যা, ঐক্য, ভালোবাসা ইত্যাদি সদগুণাবলির চর্চা থাকে না। মানুষ পরস্পরকে অবিবাহাস ও সন্দেহ করে। ফলে সমাজে নানা অরাজকতা ও অশান্তির সৃষ্টি হয়।

মহানবি (স.)-এর হাদিস নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আমরা পূর্বপাঠে হাদিসের পরিচয় লাভ করেছি। হাদিসের মাধ্যমে আমরা প্রিয়নবি (স.)-এর বাণী ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তিনি মানুষের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন তা জানতে পারি। তাঁর উত্তম চরিত্রের কথা জানতে পারি। তিনি আমাদের জন্য কী দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন তাও আমরা হাদিস পড়ে জানতে পারি।

হাদিস শরিফে প্রিয়নবি (স.) আমাদের নানাবিধ নৈতিক ও মানবিক আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। দয়া, ক্ষমা, সাহায্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, পরস্পর সহযোগিতা ইত্যাদি গুণ অনুশীলনের জন্যে উৎসাহিত করেছেন। আবার মিথ্যা বলা, প্রতারণা করা, চুরি-ডাকাতি করা, গালি-গালাজ করা, ঠাট্টা-বিক্রপ করা ইত্যাদি বারাপ কাজ করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। হিংসা-বিষেধ, পর্ব-অহংকার, খোশামোদ-তোখামোদ ইত্যাদিও বারাপ অভ্যাস। এগুলো মানবিক আদর্শের বিপরীত। এগুলো নৈতিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করে। এগুলো থেকেও বিরত থাকার জন্যে মহানবি (স.) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

إِنَّكُمْ وَالْحَسَنَاتِ وَالْحَسَنَاتِ بِأَكْثَرِ النَّارِ الْمُطَهَّرِ

অর্থ: তোমরা হিংসা থেকে বিরত থাকবে। কেননা আগুন যেমন কাঠকে পুড়িয়ে দেয় হিংসার তেমনি নেক আমলসমূহকে ধ্বংস করে দেয়। (আবু দাউদ)

সন্তোষাবলির অনুশীলন ও অসং গুণাবলি থেকে বেঁচে থাকার মাধ্যমে আমরা উত্তম চরিত্রবান হতে পারি। এগুলো আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষায়ও সাহায্য করে। এভাবে হাদিসের শিক্ষা আমাদের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলবে।

হাদিস শরিফে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত্র ও উত্তম চরিত্রের আদর্শ বর্ণিত আছে। আমাদের প্রিয়নবি (স.) ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। আব্দুল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ্ (স.)-কে বলেছেন-

وَأَنَّكَ لَعَلَّ لَحْنِي عَظِيمٌ অর্থ: নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা আল-হালাম: ৪) মহানবি (স.) ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তিনি সবসময় নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অনুসরণ করতেন। তাঁর একটি উপাধি ছিল আল-আমিন। আল-আমিন অর্থ বিশ্বাসী, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী। তিনি সবসময় সত্যকথা বলতেন। কথা ও কাজে সত্যতা অবলম্বন করতেন। কেউ কোনোকিছু আমানত বা গচ্ছিত রাখলে তিনি তা মালিকের নিকট ঘাফখভাবে ফেরত দিতেন। তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না, ওয়াদা ভঙ্গ করতেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করতেন না। ফলে তাঁর শহুরাও তাঁকে আল-আমিন বা বিশ্বাসী নামে ডাকত।

এভাবে দেখা যায়, সবধরনের সন্তোষ রাসুলুল্লাহ্ (স.)-এর চরিত্রে বিলম্বমান ছিল। তিনি ছিলেন ক্ষমাশীল, সন্তোষবান, অতিখিপরাগণ, মিষ্টভাষী। তিনি অন্যায় ও অশ্লীল কাজ কখনো করতেন না। অশাশ্বত চলাফেরা ও কথাবার্তা তাঁর থেকে কখনো প্রকাশিত হয় নি। সারাজীবন তিনি মানুষকে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুলের (স.) এ আদর্শ নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার উজ্জ্বল প্রমাণ। প্রিয়নবি (স.) এর চরিত্র অনুসরণ করলে কখনোই নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ লঙ্ঘিত হবে না। বরং এর দ্বারা আমরা প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারব। আমাদের মধ্য থেকে দুর্নীতি ও পশতু দূরীভূত হবে। রাসুলের (স.) জীবনাদর্শ হাদিস শরিফে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত রয়েছে। এগুলো মানুষের জন্যে নিকনির্দেশনা স্বরূপ। আমরা হাদিস পড়ে এগুলো জানব এবং সে অনুযায়ী আমল করব।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মাখরাজ হলো স্থান।
২. জাওফ হলো ভিতরের খালি জায়গা।
৩. সূরা আল ফালাক পবিত্র কুরআনের তম সূরা।
৪. সূরা আল হুম্যাকে অংশে ভাগ করা যায়।
৫. হাদিসের অপর নাম হলো।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফে	ফতিহাতুল কিতাব বলা হয়।
২. তাজবিন অনুযায়ী কুরআন	সহযোগিতা করে না।
৩. সূরা আল ফতিহাকে	দশটি নেকি পাওয়া যায়।
৪. মিথ্যাবাদীকে কেউ সাহায্য	সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হয়।
৫. অবিধ্বাস ও সন্দেহের কারণে	পড়া আদ্বাহ তা'হালাহ নির্দেশ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আল কুরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
২. মাখরাজ বলতে কী বোঝায়?
৩. হাদিসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বিত্তম্ কুরআন পাঠে তাজবিনের ভূমিকা আলোচনা কর।
২. সূরা আল-ফতিহাহ ব্যাখ্যা লিখ।
৩. হাদিসের আলোকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সুবা আন-নাস এর আয়াতসমূহে কয় প্রকারের আলোচনা রয়েছে ?

- ক) দুই খ) তিন
গ) চার ঘ) পাঁচ

২. সুবা আন-নাসে 'আন-নাস' শব্দটি কতবার ব্যবহৃত হয়েছে ?

- ক) চার খ) পাঁচ
গ) ছয় ঘ) সাত

৩. কুরআনকে কুরআন বলা হয়, কারণ -

- i. কুরআন শরীফে কুরআন শব্দ ব্যবহার বেশি
ii. জিবরাইল (আ) প্রদত্ত নাম কুরআন
iii. আল কুরআন সবচেয়ে বেশি পাঠ করা হয়
কোনটি সঠিক ?

- ক. i
খ. ii
গ. i, ii
ঘ. i, ii, iii

অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ফিরোজ সাহেব একজন কর্মকর্তা। তিনি সবসময় মিথ্যা কথা বলেন। ফলে অফিসে নানা সমস্যা লেগেই থাকে।

৪. ফিরোজ সাহেবের উক্ত অভ্যাসের কারণে তাকে -

- i. কেউ বিশ্বাস করবে না
ii. কেউ ভালোবাসবে না
iii. কেউ সহযোগিতা করবে না

কোনটি সঠিক ?

- ক. i
খ. ii
গ. i, ii
ঘ. i, ii, iii

৫. মিথ্যা বলার অভ্যাস ফিরোজ সাহেবকে চূড়ান্তভাবে কোন দিকে নিয়ে যাবে ?

- ক. পাপের দিকে
- খ. কাণ্ডার দিকে
- গ. অকল্যাণের দিকে
- ঘ. জাহান্নামের দিকে

সুজনশীল প্রশ্ন

১. আব্দুর রহিম সুলিত কঠোর অধিকারী। তিনি অতদ্বাভাবে তাড়াহাড়ি কুরআন তিলাওয়াত করেন। অপরদিকে তার সহপাঠী-আব্দুল করিমের কঠোর সুমধুর নয়। কিন্তু তিনি সেখাে ধীরে ধীরে ও সুস্পষ্টভাবে তিলাওয়াত করার আহ্বান চেষ্টা করেন।

- ক. আল কুরআনের অবতীর্ণ পূর্ণাঙ্গ প্রথম সূরা কোনটি ?
- খ. 'হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ কর' আয়াতটি বুঝিয়ে লেখ।
- গ. আব্দুর রহিমের তিলাওয়াতে শরিরতের কোন বিধানটি পালন হয় নি ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. আব্দুল করিমের কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতিটি পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. সাদিয়া ও নাদিয়া একই অফিসে চাকরি করেন। তাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উভয়কে দুইটি কাজ ভাগ করে দেন। ফলে তারা উভয়ে উক্ত কাজ যথাসময়ে সমাপ্ত করার প্রতিজ্ঞা করেন। সাদিয়া নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ করলে কর্তৃপক্ষ খুশি হয়ে পদোন্নতি প্রদান করেন। কিন্তু নাদিয়া যথাসময়ে কাজ শেষ করতে না পারায় তিরস্কারের শিকার হন। ফলে নাদিয়া সাদিয়াকে হিংসা করতে শুরু করলে সাদিয়া বলেন, 'পরহিংসা নরক বাস, যুগে যুগে সর্বনাশ'।

- ক. হাদিস শব্দের অর্থ কী ?
- খ. "নিভয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত" বানীটি বুঝিয়ে লেখ।
- গ. সাদিয়ার কর্মে কী প্রকাশ পেয়েছে ? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. নাদিয়ার কর্মকাণ্ডের পরিণাম সর্বপ্রতি হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায় আখলাক (أَخْلَاقُ)

মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে সৃষ্টির সেরা হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা বজায় রাখতে হলে প্রয়োজন সুন্দর আচার আচরণ। মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের মাধ্যমে যেসব আচার-ব্যবহার, চাল-চলন এবং স্বভাবের প্রকাশ ঘটে সেসবের সমষ্টিই আখলাক। এটি শুধু মানুষের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং জীবজন্তু, পশুপাখি, পাছপালা ও পরিবেশের সাথেও সুন্দর আচরণ প্রয়োজন।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আখলাকের ধারণা বর্ণনা করতে পারব।
- সদাচরণের ধারণা ও কতিপয় সদাচরণের গুরুত্ব ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- কতিপয় অসদাচরণের ধারণা, পরিণতি এবং এগুলো পরিহারের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ধূমপান ও মাদকাসক্তির ধারণা ও কুফল বর্ণনা করতে পারব।
- বাস্তব জীবনে সদাচরণে আগ্রহী হবে, অসদাচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ হবে এবং নিকটতম ব্যক্তিদেরও বিরত থাকতে অনুপ্রাণিত করব।
- ধূমপান ও মাদকাসক্তিজনিত সামাজিক ক্ষতি এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে আগ্রহী হব।

মানুষ সামাজিক জীব। পরিবার এবং সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। কখনও আখলাক (আচরণ) প্রশংসনীয় হয় আবার কখনো নিন্দনীয় হয়। প্রশংসনীয় আচরণকে আখলাকে হামিদাহু বা সঠিক বলে। আর নিন্দনীয় আচরণকে আখলাকে যামিমাহু বলে।

আখলাকে হামিদাহু বা প্রশংসনীয় আচরণগুলো হলো সত্যবাদিতা, পিতামাতার প্রতি উত্তম ব্যবহার, শিক্ষকদের সম্মান করা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী সহপাঠীদের সাথে সদাচরণ, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি।

আখলাকে যামিমাহু বা নিন্দনীয় আচরণগুলো হলো মিথ্যা কথা বলা, পরনিন্দা করা, আমানতের বিয়ানত করা, গালি দেওয়া, আত্মীয়স্বজনের সম্পর্ক ছিন্ন করা ইত্যাদি। প্রতিটি মানুষের আখলাকে হামিদাহু অর্জন ও আখলাকে যামিমাহু বর্জন করা উচিত। আমরা আখলাকে হামিদাহু অর্জন করব এবং আখলাকে যামিমাহু বর্জন করব।

পাঠ ১ আখলাকে হামিদাহু (الْأَخْلَاقُ الْحَمِيدَةُ)

আখলাকে হামিদাহু বা প্রশংসনীয় আচরণ মানুষের জীবনে খুবই প্রয়োজন। সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ্য তাব বজায় থাকে। পারস্পরিক সেনসেন সহজতর হয়। জীবন হয়ে ওঠে মধুময়। তাই সচরিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন, “কিয়ামতের দিন দাঁড়ি-পাল্লায় সবচেয়ে ভারী জিনিস হবে মুমিনের উত্তম চরিত্র।” (তিরমিযি) মহানবি (স.) আরও বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় যার চরিত্র উত্তম।” (বুখারি, মুসলিম)।

মহান আদ্রাহ মানুষকে অসংখ্য নিয়ামত দান করেছেন। এগুলোর মধ্যে সচরিত্র একটি উত্তম নিয়ামত। সচরিত্র শিক্ষার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছেন আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.)। পরিপূর্ণ সচরিত্রের প্রতীক ছিলেন তিনি। এ সম্পর্কে আদ্রাহ বলেন—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থ : “তোমাদের জন্য আদ্রাহর রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।” (সূরা আল-আহযাব, আয়াত : ২১)
মহানবি (স.)—এর চরিত্রের মধ্যে সদাচরণের গুণগুলো পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসুল (স.) ঘোষণা করেন :

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَرِمَةَ الْأَخْلَاقِ

অর্থ : “আমি উত্তম চরিত্রিক গুণাবলি পরিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছি।” (ইবনে মাযাহ)

আমাদের জন্য মহানবি (স.)—এর সমগ্র জীবনই উত্তম অনুকরণীয় আদর্শ। আমরা মহানবি (স.)—এর জীবন অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলব।

কাঙ্ক্ষা : শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে করেকটি দলে ভাগ হয়ে ভালো অভ্যাস ও মন্দ অভ্যাসের তালিকা বা চার্ট তৈরি করে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ২ সত্যবাদিতা (الصِّدْقُ)

সত্যবাদিতার আরবি প্রতিশব্দ হলো সিদক (صِدْقٌ)। এর অর্থ হলো সত্যতা, সত্যবাদিতা, সত্যকথা বলা, সত্য সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি। বাস্তব বা প্রকৃত ঘটনা যথাযথ প্রকাশ করাকে সত্যবাদিতা বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে এ মহৎগুণ আছে তাকে বলে সাদিক (صَادِقٌ) বা সত্যবাদী। যে সত্য কথা বলে তাকে সবাই ভালোবাসে ও সম্মান করে। সত্যবাদী দুনিয়াতে যেমন সম্মানের অধিকারী হন তেমনিভাবে আখিরাতেও পরম সুখ লাভ করবেন। আমাদের শ্রিয় নবি (স.) বাল্যকাল থেকে সকলের নিকট সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাই সবাই তাকে আল-আমিন বলে ডাকত এবং সম্মান করত। তিনি জীবনে মিথ্যা কথা বলেন নি। প্রাণের শত্রুও তাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারে নি। যে সত্য কথা বলে না তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) সত্যবাদিতা সম্পর্কে বলেন-

فَإِنَّ الصِّدْقَ ضَمَائِدَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رَيْبَةٌ (তিরমিযি)

সত্যবাদিতার উপকারিতা সম্পর্কে নবি করিম (স.) আরও বলেন, “তোমাদের অবশ্যই সত্যবাদী হওয়া উচিত। কেননা সত্যবাদিতা মানুষকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করে, আর পুণ্য বেহেশতের পথে পরিচালিত করে।”
পবিত্র কুরআনুল কারিমে সত্যবাদীকে জান্নাত (বেহেশত) দানের কথা বলা হয়েছে।

هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

অর্থাৎ “এইতো সে দিন- যে দিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যতার জন্য উপকৃত হবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে।” (সূরা আল-মায়িদা, আয়াত : ১১৯)

আমাদের বক্তৃতির হযরত আব্দুল কাদির জিলানি (র.)-এর জীবনে সত্যবাদিতা সম্পর্কে একটি বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। তখন তিনি অল্পবয়স্ক বালক। শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনি বাগদাদ রওনা হলেন। গমনের সময় মা তাঁকে সর্বদা সত্য কথা বলার আদেশ করেন। পথিমধ্যে একদল ডাকাত তাদের কাফেলার উপর হামলা করে। ডাকাত দল একে একে কাফেলার সকলকে তদ্রূপি চালায়। তদ্রূপির সময় বালক আব্দুল কাদিরকে জিজ্ঞাসা করল যে হে বালক, তোমার কাছে কিছু আছে কি? তিনি নির্ভয়ে উত্তর দিলেন, “চত্বিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে।” তাঁর কথা যাচাইয়ের জন্যে ডাকাত সর্দার ধমক দিয়ে বলল, “কোথায় স্বর্ণমুদ্রা? আমাদের তা দেখাও। তিনি তার জামার আঁতিনে লোশাই করা অবস্থায় ডাকাতদের তা বের করে দেখালেন। ডাকাতরা তাঁর সত্যতা দেখে অবাক হয়ে বলল, এরূপ লোকানো স্বর্ণমুদ্রা আমরা খুঁজে পেতাম না, তুমি কেন বললে? তিনি বললেন, “আপনারা জিজ্ঞেস করায় আমি সত্য কথা বলে দিয়েছি। কারণ আমার মা আমাকে সর্বদা সত্য কথা বলতে বলেছেন।”

ডাকাতরা বালক আব্দুল কাদিরের সততার মুহূর্তে নিজেদের পাপকর্ম সম্পর্কে অনুশোচনা করল। তারা ডাকতি ছেড়ে দিয়ে সং পথে চলার প্রতিজ্ঞা করল। সত্যবাদিতা এভাবেই মানুষকে মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখায়।

আমাদের প্রতিজ্ঞা: সদা সত্য কথা বলব।

[শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের একত্র আরও ছোট ঘটনা বলে শুনাতে এবং তাদের একত্র আরও ছোট ছোট ঘটনা বলার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।]

কাজ : যদি বালক আব্দুল কাদির সত্য গোপন করত তাহলে কী ক্ষতি হতে পারত। শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে খাতায় লিখে দেখাবে।

পাঠ ৩

পিতা-মাতার প্রতি কর্তব্য

সুন্দর পৃথিবীতে পিতা-মাতা আমাদের সবচেয়ে আপনজন। আমাদের জীবনে তাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি। জন্মের সময় আমরা হিলাম অসহায়। আমরা নিজেদের প্রয়োজনের কথাও বলতে পারতাম না। পিতামাতা যত্ন ভরা রহমতমা দিয়ে লালন পালন করে আমাদের বড় করে তোলেন। অসুখ-বিসুখে দিন রাত কষ্ট করে সেবাযত্ন করেন। সুশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। পিতা মাতা আমাদের জন্য আত্মাহুতির সেরা দান। তাঁরা সর্বদা আমাদের কল্যাণ কামনা করেন। পিতা-মাতার চেয়ে আপনজন পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সুতরাং একদল কল্যাণকামী পিতামাতার প্রতি আমাদেরও কিছু দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে।

কর্তব্য

পিতামাতার আদেশ-নিষেধ পালন সন্তানের জন্য ওয়াজিব (কর্তব্য)। সেইসাথে পিতামাতার সেবা-যত্ন করাও আমাদের কর্তব্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আত্মাহুতি বলেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ

অর্থ: “তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করবে।” [সূরা বনি ইসরাইল: ২৩]

পিতামাতা যত্ন হলে সন্তান তাদেরকে অবিকতর সেবা-যত্ন করবে। তাঁদেরকে ধমক দেবে না বা মনে কষ্ট পায় একদল কোনো কথা বা কাজ করবে না। তাঁদের সাথে উত্তম ও সম্মানজনক ভাষায় কথা বলবে। এ সম্পর্কে আত্মাহুতি বলেন—

إِنَّمَا يَنْبَغُ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمْ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

অর্থ: ‘যদি পিতামাতার একজন অথবা উভয়ে তোমার নিকট বার্ধক্য উপনীত হয়, তবে তাঁদের প্রতি তুমি বিরক্তিসূচক শব্দ ‘উহ’ উচ্চারণ কর না এবং তাঁদেরকে ধমক দিও না। তাঁদের সাথে সম্মানজনক ভাষায় কথা বলো।’

(সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত-২৩)

তাদের উদ্দেশ্যে সর্বদা আত্মাহর নিকট আমাদের এই দোয়া করা উচিত—

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِى صَغِيرًا ۝

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার পিতামাতার প্রতি তেমনি সদয় হও! যেমনিভাবে তঁরা আমাকে শৈশবে (আদর-যত্নে) লালন পালন করেছেন। (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৪)

পিতামাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করা সন্তানের উপর কর্তব্য। এ সম্পর্কে মহান আত্মাহ বলে—

قُلْ مَا أَتَقَفُّكُمْ فَرَىٰ عَيْنِي قَلِيلًا ۖ وَالْأَقْرَبُونَ

অর্থ : “বলুন, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে।” (সূরা বাকারা, আয়াত : ২১৫)

পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করা আমাদের কর্তব্য।

এ সম্পর্কে মহানবি (স.)-এর বাণী :

الْهَيْئَةُ تَحْتَ أَقْدَمِ الْأُمَّهَاتِ

অর্থ : “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।” (আত-তারগিব)

মহানবি (স.) আরও বলেছেন, “পিতার সন্তুষ্টিতে আত্মাহর সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আত্মাহর অসন্তুষ্টি”। (তিরমিযি)

পিতামাতার প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করলে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করা যায়।

পিতা মাতা আমাদের জন্য আত্মাহর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। আমরা তাঁদের সাথে সদ্যব্যবহার করব। তাঁদের অবাধ্য হবো না। তাঁদের জন্য দোয়া করবো।

কাছ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে পিতামাতার প্রতি
কী কী কর্তব্য রয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্তব্য

আত্মীয় শব্দটি এসেছে আত্মা থেকে। আত্মার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আত্মীয় বলে। যাদের সাথে জীবনের ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তাদের আমরা আত্মীয় বলি। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা ও সজ্ঞানের পর অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে যারা অগ্রগণ্য তারাই আত্মীয়। যেমন : ভাই-বোন, দাদা-দাদি, নানা-নানি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, স্বস্তর-স্বাত্তি এবং অন্যান্য ঘনিষ্ঠ আপন হন।

ইসলামি সমাজে পিতামাতার ন্যায় আত্মীয়স্বজনের প্রতিও আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আত্মীয়দের মধ্যে যারা বড় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানো এবং যারা ছোট তাদের অবশ্যই আদর ও স্নেহ করতে হবে। আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। আত্মীয়দের মধ্যে গরিব-খনী নির্বিশেষে সকলের সাথে সৌজন্যমূলক সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। গরিব ও অভাবগ্রস্ত আত্মীয়দের প্রয়োজনীয় সাহায্য করতে হবে। এ সম্পর্কে আশ্চাহর বাণী :

وَأَيُّ الْمَالِ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ

অর্থ : “আশ্চাহর ভালোবাসা লাভের জন্য নিকট আত্মীয়দের দান করে।” (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত : ১৭৭)

আত্মীয়রা রোগাক্রান্ত হলে তাদের সেবাবদ্ধ করতে হবে। বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর নিতে হবে। আত্মীয়দের সাথে সম্ভাবনার করার জন্য স্বয়ং আশ্চাহ তা’হালা নির্দেশ দিয়েছেন—

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَحْسَنُوا وَإِيذَى الْقُرْبَىٰ

অর্থ : “পিতামাতার সাথে সম্ভাবনার করবে এবং নিকট আত্মীয়দের সাথেও উত্তম আচরণ প্রদর্শন করবে।” (সূরা আন-নিসা, আয়াত-৩৬)

তিনি আরও বলেন—

إِنَّ لِلَّهِ تَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

অর্থ : “নিশ্চয়ই মহান আশ্চাহ ন্যায়বিচার কায়ম করতে, পরস্পরের প্রতি ইহুসান করতে ও আত্মীয়স্বজনের অধিকার আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন।” (সূরা আন-নাহল, আয়াত-৯০)

আত্মীয়দের কোনোরূপ কষ্ট দেয়া যাবে না। আত্মীয়দের সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না।

এ মর্মে রাসূল (স) বলেছেন :

لَا تَذُولُ الرِّحْمَةَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحْمٍ

অর্থ : “যে সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে সে সম্প্রদায়ের প্রতি আশ্চাহর রহমত বর্ষিত হয় না।” (বায়হাকি)

কোনো অন্যায় বা অসৎ কাজে আত্মীয়কে সাহায্য করা যাবে না। বরং অন্যায় কাজ থেকে তাকে বিরত রাখাই দায়িত্ব। আত্মীয়দের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করলে পৃথিবীতে লাভবান হওয়া যায়। নবি কারিম (স.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার জীবিকা ও আয়্য বৃদ্ধি পাক, সে যেন আত্মীয়দের সাথে সুন্দর আচরণ করে।” (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

আত্মীয়স্বজনের সাথে আমরা সকলে ভালো ব্যবহার করব। তাদের প্রাণ্য আদায় করব। তাদের দুঃখ-কষ্টে সাহায্য সহযোগিতা করব। তাদের সকল বৈধ কাজে সহযোগিতা করব।

কাজ : শিক্ষার্থীরা আত্মীয়দের সাথে কীভাবে সদাচরণ করা যায় তার একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৫

প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য

মানুষ সামাজিক জীব। আমরা সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করি। আমাদের আশেপাশে আরও অনেক লোক বসবাস করে। আমাদের চারপাশে আরও যারা বসবাস করে তারা সকলেই আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন, “সামনে- পেছনে ডানে বামে চক্কর ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী।” ছাত্রী বা অস্থায়ীভাবে পাশাপাশি অবস্থানকারী কিংবা সাময়িকভাবে আশেপাশে অবস্থানকারীকে প্রতিবেশী বলা হয়। এমনকি চলার পথের সহযাত্রীদেরও প্রতিবেশী বলা যায়।

কর্তব্য

আমরা মুসলমান। আমাদের চারপাশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যারা বসবাস করে তারা সবাই আমাদের প্রতিবেশী। প্রতিবেশীদের সাথে সদ্‌ব্যবহার ও সুন্দর আচরণ করা আমাদের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স.)-এর বাণী :

خَيْرُ الْجُزْأَنِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ هُوَ كَارٍ

অর্থ : “আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশী সর্বাপেক্ষা উত্তম, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম।” (আল জামে’ সগির)
প্রতিবেশীকে বিপদে-আপদে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে। মহানবি (স.) এ সম্পর্কে আরও বলেন,

“সেই ব্যক্তি আমার উপর প্রকৃত ইমান আনেনি যে আরামে রাত কাটায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত।” (দারিমি)

অসুখে-বিসুখে প্রতিবেশীর বোজ-খবর নেয়া প্রয়োজন। প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা উচিত নয়, তাদের মঙ্গল কামনা করা, কোনো প্রকার কষ্ট না দেয়া এবং অন্যায়-অত্যাচার না করা আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এ বিষয়ে রাসূল (স.) বলেন –

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَ لَبِائِقِهِ

অর্থ : “সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ থেকে নিরাপদ নয়।” (মুসলিম)

প্রতিবেশীদের একজনের হক অন্যজনের কাছে আমানতস্বরূপ। এ আমানতকে অবশ্যই হিফায়ত করতে হবে। প্রতিবেশী যে কেউ কিংবা যেমনই হোক, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকলকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।

প্রতিবেশীকে প্রথমে সালাম দেওয়া এবং খানা-পিনায় শরিক করা প্রতিবেশীর কর্তব্যের শামিল। তাদের মাঝে উপহার উপঢৌকন বিনিময় করাও প্রতিবেশীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রতিবেশীকে কোনোরূপ ঘৃণা করা যাবে না এবং হীন ও নগণ্য মনে করা যাবে না। প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেন,

“প্রতিবেশীর হক হলো, সে যদি রোগাক্রান্ত হয় তাহলে তুমি তার সেবা করবে। সে মরে গেলে তার লাশের সঙ্গে কবরস্থান পর্যন্ত যাবে, কান্দন দাফনে অংশগ্রহণ করবে। সে যদি অর্থ অভাবে পড়ে, তাহলে তুমি তাকে ঋণ দেবে, সে যদি পরনের জন্য কাপড় সঙ্গ্রহ করতে না পারে, তাহলে তুমি তাকে কাপড় সঙ্গ্রহ করে দেবে। আর যদি কোনো কল্যাণ হয় তুমি তাকে মুবারকবাদ জানাবে। সে যদি কোনো বিপদে পতিত হয় তবে তুমি তার দুঃখের ভাগ নেবে, সহানুভূতি জানাবে। তোমার ঘর তার ঘর থেকে উঁচু বানিয়ে তাকে মুক্ত বায়ু থেকে বঞ্চিত করবে না। তোমার রান্নার পাত্রের বাতাস দিহেও তাকে কষ্ট দেবে না। যদি তেমন অবস্থা হয়ই তাহলে তাকে এক চামচ খাবার পাঠিয়ে দেবে।” (তাবারানি)

প্রতিবেশী অভাবগ্রস্ত, দরিদ্র বা শ্রমজীবী হলে ও তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে। তাদের পেশাকে সম্মান করতে হবে। সুখে-দুঃখে পাশে থাকতে হবে, সম্মানের সাথে তাদের সেবাধন করতে হবে।

আমরা প্রতিবেশীর সাথে মিলেমিশে থাকবো। সুখে দুঃখে বিপদে আপদে তাদের পাশে দাঁড়াবো আদের সাথে ঝগড়া বিবাদ করব না।

কাজ : প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার সুফল সম্পর্কে দলীয়ভাবে পাঁচটি করে বাক্য লিখে শিক্ষককে দেখাবে।

পাঠ ৬

বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ

মানব চরিত্রের একটি প্রশংসনীয় আচরণ হলো বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করা। একজন আদর্শ মানুষ বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করেন। শ্রিয় নবি (স.) বড়দের সম্মান করতেন এবং ছোটদের আদর করতেন। তিনি সর্বদা ছোটদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা করতেন।

বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের স্নেহ করার গুণত্ব অপরিণীম। এর মাধ্যমে ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান করতে শিখে এবং বড়রা ছোটদের স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন। ফলে সমাজে এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

মহানবি (স.) বলেন—

لَيْسَ وَمِثْلَانِ لَمْ يَزِدْ صَغِيرًا وَلَمْ يُؤْزِرْ كَبِيرًا

অর্থ : “সে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয় যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের শ্রদ্ধা—সম্মান করে না।” (তিরমিযি)

বড়দের সালাম প্রদান করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, সৌজন্য বজায় রেখে কথাবার্তা বলা, প্রয়োজনে বড়দের কাজকর্মে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলা এবং বলা থাকলে উঠে তাদের বসার ব্যবস্থা করা ছোটদের ও মানবিক কর্তব্য।

বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলে পরকালে বিশেষ সাওয়াব অর্জিত হবে এবং জাহান্নাত লাভ সহজ হবে।

ছোটদের আদর সোহাগ করা, তাদের ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করা বড়দের কর্তব্য। এতে ছোটদের মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়।

শ্রিয় নবি (স.) বলেছেন :

“কোনো বৃদ্ধকে যদি কোনো যুবক বার্ষিকের কারণে শ্রদ্ধা করে, তাহলে আল্লাহ তা’আলা ঐ যুবকের জন্য বৃদ্ধ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে শ্রদ্ধা করবে।” (তিরমিযি)

কাজ : শিক্ষার্থীরা চার-পাঁচজন করে দলে বিভক্ত হয়ে বড়দের প্রতি

ছোটদের করণীয়গুলো পোস্টারে লিখে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ৭

সহপাঠীদের সাথে সম্ব্যবহার

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে মিলেমিশে কাজকর্ম করতে হয়। আমরা যে স্কুল বা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি, সেখানে আমাদের সাথে আরও অনেকে পড়াশোনা করে। বিদ্যালয়ে আমরা থাকার সাথে একই শ্রেণিতে লেখাপড়া করি তারা সকলেই আমাদের সহপাঠী। সহপাঠীদের সাথে আমাদের আন্তরিক ও মধুর সম্পর্ক রয়েছে। সহপাঠীরা আমাদের ভাইবোনের মত। স্কুলে আমরা একে অপরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখি। স্কুলে আমাদের সহপাঠীদের কেউ অসুস্থ হলে সেবা করা আমাদের কর্তব্য। প্রয়োজনে ডাক্তারের নিকট নিয়ে যেতে সাহায্য করতে হবে। প্রয়োজনীয় প্রব্যসামগ্রী যেমন- বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, কারও না থাকলে তাকে দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আমাদের সহপাঠীদের মধ্যে কারও মন খারাপ হলে, বিষণ্ণ বা চিন্তিত হলে তার বিষণ্ণতার ভাব দূর করার চেষ্টা করতে হবে। সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ করা উচিত। তাদেরকে উত্তম শব্দে সম্বোধন করতে হবে।

কাউকে খাটো করে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে, একে অপরকে মর্যাদা দিতে হবে। সহপাঠীদের সাথে কটুবাক্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কারও মনে কষ্ট পেতে পারে এমন কোনো আচরণ থেকে বিরত থাকব। কেউ কোনো বিপদে পতিত হলে বিপদ দূর করার চেষ্টা করব। কারো ব্যথায় সাধুনা দেব। কাউকে উপনামে ডাকব না। কারও পেছনে লাগবো না। দোষ-ত্রুটি ধরে লজ্জা দেব না।

সহপাঠীদের সুখে আমরা সুখী হই আবার কারও কোনো দুঃসংবাদ শুনে আমরা ব্যথিত হই। দৈর্ঘ্য ধারণের পরামর্শ প্রদান করি। কখনো কোনো সুখের পেলো আমরা তার আনন্দে শরিক হই।

সহপাঠীদের সাথে সম্ব্যবহার করলে বা সম্পর্ক থাকলে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ভালো থাকে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর হয়। সুশিক্ষার জন্য এটা খুব প্রয়োজন।

কাজ : শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট মলে ভাগ হয়ে সহপাঠীদের প্রতি কর্তব্যের একটি তালিকা তৈরি করবে।

পাঠ ৮ আখলাকে যামিমাহু (الْأَخْلَاقُ النَّوِيَّةُ)

আখলাকে যামিমার অর্থ হলো অসদাচার বা নিন্দনীয় আচরণ। এমন কতগুলো নৈতিক অবক্ষয়মূলক আচরণ যা মানুষকে হীন, নীচ, ইতর প্রণিভুক্ত ও নিন্দনীয় করে। মিথ্যাচার, পিষত, পরনিন্দা, গালি দেওয়া ইত্যাদি আখলাকে যামিমাহ বা নিন্দনীয় আচরণ। এগুলো বর্জন করতে হবে। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আচরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহর বাণী :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

অর্থ : “তোমরা সত্যের সাথে অসত্যের মিশ্রণ ঘটিও না এবং তোমরা জেনে-তুনে সত্য গোপন করো না।”
(সূরা আল-বাকারাহ : ৪২)

এ প্রসঙ্গে মহানবি (স.) বলেছেন, “কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তির সম্মান সবচেয়ে নিকট হবে যার অনিষ্টের ভয়ে লোকেরা তাকে পরিত্যাগ করে।” (বুখারি ও মুসলিম)

আমাদের প্রিয়নবি যাবতীয় নিন্দনীয় আচরণ থেকে পবিত্র ছিলেন, তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলেন নি। কাউকে তিনি কখনও গালি দেন নি। ওয়াদা ভঙ্গ করেন নি, কারও সাথে প্রতারণা করেন নি।

আমরা রাসুল (স.)-এর এ সকল আদর্শ অনুসরণ করব।

আমাদের প্রতিজ্ঞা—

- আমরা কখনও মিথ্যা কথা বলব না।
- ওয়াদা ভঙ্গ করব না।
- প্রতারণা করব না।
- কারও গিষত করব না।

পাঠ ৯ মিথ্যাচার (الْكَيْبُ)

মিথ্যা সকল পাপ কাজের জননী। প্রকৃত অবস্থা বা ঘটনাকে বিকৃত করে পরিবেশন করাকে মিথ্যাচার বলে। যে ব্যক্তি মিথ্যাকথা বলে বা প্রকৃত ঘটনার বিকৃতি ঘটায় তাকে মিথ্যাবাদী বলে।

মিথ্যা একটি অত্যাধিক অপরাধ। এটি সকল পাপ কাজের মূল। মিথ্যা থেকে পাপ কাজের সূচনা হয়। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, অন্যের মাল অপহরণ এ সকল অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মের মূলে রয়েছে মিথ্যাচার। যে সমাজে মিথ্যাচার বৃদ্ধি পায় সে সমাজ ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়।

মিথ্যাচার একটি নিদনীয় আচরণ। মিথ্যাবাদীকে কেউ ভালোবাসে না। কেউ বিশ্বাস করে না। বিশদের সময় তাকে কেউ সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। সকলে তাকে ঘৃণা করে। তার কথাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না। পরিণামে দুনিয়াতে তার জীবন দুর্বিধ হতে গঠে। মহান আল্লাহ তা'য়ালার উপর খুব অসন্তুষ্ট হন। আর তাই পরকালে তার স্থান হবে জাহান্নাম।

মহানবি (স.) এ বিষয়ে বলেন—

إِيَّاكُمْ وَالْكَيْبُ فَإِنَّ الْكَيْبُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ

অর্থ: “আর তোমরা অবশ্যই মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা মিথ্যা পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। আর পাপ কাজ জাহান্নামের পথে ধাবিত করে।” (বুখারি ও মুসলিম)

মিথ্যা বর্জন করা কর্তব্য। মিথ্যা পরিত্যাগ করলে সকল পাপ থেকে বাঁচা যায়। মিথ্যাবাদীর কাছ থেকে রহমতের ফেরেশতারাও দূরে সরে যান। মহানবি (স.) বলেছেন, “বান্দা যখন মিথ্যা কথা বলে, ফেরেশতারা তখন এর দুর্গন্ধের কারণে তার থেকে দূরে চলে যান।” (তিরমিযি)

আমাদের গ্লিয় নবি (স.) কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না। তিনি স্বার্থের পরিপন্থী হলেও কখনও মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতেন না।

একবার এক ব্যক্তি মহানবি (স.)-এর কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি চুরি করি, মিথ্যা বলি এবং আরও অনেক অন্যার কাজ করি। এমতাবস্থায় আমি কেমন করে এসব কাজ থেকে মুক্তি পাব?’ রাসূল (স.) বললেন, “তুমি মিথ্যা কথা বলা ছেড়ে দাও।” লোকটি রাসূল (স.)-এর কথা মেনে মিথ্যা পরিত্যাগ করার কারণে পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হলো।

কাজ : শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে সত্যের উপকারিতা এবং মিথ্যার অপকারিতার উপর একটি পোস্টার লিখে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১০ গিবত বা পরনিন্দা (الغيبه)

গিবত একটি সামাজিক অনাচার। কারও অগোচরে তার দোষত্রুটি অন্যের কাছে প্রকাশকে গিবত বলে। একে পরনিন্দাও বলা যায়। গিবত একটি ঘৃণিত ও জঘন্য কাজ। এটি কবির গুনাহ। এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসূল (স.) বলেন, “গিবত কী তা কি তোমরা জান? লোকেরা উত্তরে বললো, আদ্রাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূল (স.) বললেন, গিবত হলো তোমার ভাইয়ের সম্পর্কে তোমার এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, এটাও কি গিবত হবে? রাসূলদ্বারা (স.) বললেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই গিবত হবে। আর তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তা হবে ‘বুহতান’ বা অপবাদ। (মুসলিম)

গিবত একটি নিন্দনীয় কাজ। গিবতের মাধ্যমে মানুষে মানুষে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি হয়। এর মাধ্যমে সমাজ জীবনে ঝগড়া-ফাসাদসহ নানা অশান্তি সৃষ্টি হয়।

পবিত্র কুরআনুল কারিমে গিবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

আদ্রাহর যাদী :

তোমরা একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে, নিশ্চয়ই তা তোমরা অপছন্দ করবে। (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত : ১২)

গিবত করার মতো গিবত শোনাও পাশের কাজ। কেউ গিবত করলে তাকে গিবত থেকে বিরত রাখা কর্তব্য। তাহলে গিবতচর্চা সমাজ থেকে ক্রমে ক্রমে ত্রাস পাবে বা দূরীভূত হবে।

সর্ববিছায়ে গিবত বা পরনিন্দা হতে মুক্ত হতে হবে। কারণ কোনো অবস্থায়ই গিবত জায়েজ বা বৈধ নয়। কেউ যদি গিবত করে তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যার গিবত করা হয়েছে তার থেকে অবশ্যই মাফ করিয়ে নিতে হবে।

আর যদি সে মারা যায়, তার থেকে ক্ষমা চাওয়া সম্ভব না হয়, তবে আদ্রাহর নিকট তার গুনাহ মাক্ফের দোয়া করতে হবে। রাসূল (স.) বলেন, নিরসলেহে গিবতের একটি ক্ষতিপূরণ হলো, তুমি যার গিবত বা কুৎসা রটনা করেছ তার জন্য এভাবে দোয়া করবে: হে আদ্রাহ! তুমি আমার ও তার গুনাহ মাফ করে দাও।

এক মুসলমানের সম্পদ, জীবন ও সম্মান অপর মুসলমানের কাছে পবিত্র আমানত। গিবত অপর মুসলমান ভাইয়ের সম্মান নষ্ট করে বিধায় এটি ইসলামে হারাম।

গিবত ব্যক্তির থেকেও অধিকতর অপরাধ। রাসূল (স.) বলেছেন, “গিবত বা পরনিন্দা ব্যক্তির অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ।” (আল মুজালাল আওসাত)

কাজ : শিক্ষার্থীরা দলে বিভক্ত হয়ে কী কী কাজ গিবত বা পরনিন্দার মধ্যে পড়ে, তার একটি চার্ট তৈরি করে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

পাঠ ১১

গালি দেওয়া (الْكَلْبُ)

কাউকে মন্দ নামে ডাকা, মন্দ কথা বলা, তিরস্কার করা, অশালীন বা অশ্লীল কথা বলা হলো গালি দেওয়া। কারও সম্পর্কে এরূপ বাক্য ব্যবহার করা যাতে তার হীনতা ও খুণা প্রকাশ পায় তাও গালিধ্বংস। কাউকে গালি দেওয়া বা মন্দ নামে ডাকা নিষিদ্ধ কাজ। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, “ইমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ।” (সূরা আল-হুসুরাত, আয়াত : ১১)

মানুষ সভ্যজাতি, তারা কাউকে গালি দেবে না। সমাজে একত্রে বসবাস করতে হলে পরস্পরের সাথে মতের অমিল থাকতে পারে। একে অপরের সাথে ভুল বুঝাবুঝিও হতে পারে। একের সাথে অন্যের কথা কাটিকাটি হতে পারে। কিন্তু তাতে একে অন্যকে অশালীন বা অশ্লীল কথা বলে গালি দেওয়া উচিত নয়। অশালীন কথা বলা নিত্যন্তই খারাপ কাজ। যে গালি দেয়, অশালীন কথা বলে, সে সমাজে ঘৃণিত। তাকে মানুষ পছন্দ করে না। সমাজে তার কোনো সমাদর থাকে না। তার সাথে কেউ বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে না।

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ (স.) গালি দিতে বা গালিপালাজ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন—

سَبَّابُ الْمُتَمَلِّمِ فَسُوقٌ وَتَكَالُفٌ

অর্থ : মুসলমানদের গালি দেওয়া গাপ এবং হত্যা করা কুফরি। (বুখারি ও মুসলিম)
কেউ যদি গালি দেয় তবে তার উত্তরে গালি দেওয়া উচিত নয়।

একবার মহানবির কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আব্দুল্লাহর রাসূল আমাকে আমার সম্প্রদায়ের এমন এক ব্যক্তি গালি দেয় যে আমার থেকে নিচু। এর প্রতিশোধ নিতে আমার কোনো বাধা আছে কি” রাসূল (স) তাকে বললেন, “পরস্পর গালমন্দকারী উভয়েই শয়তান। তারা পরস্পরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং একে অপরের দোষারোপ করে।” (বুখারি ও মুসলিম)

গালি সম্পর্কে আরও বলেছেন, পিতামাতাকে গালি দেওয়া মহাপাপ। সাহাবিগণ বললেন, “হে আব্দুল্লাহর রাসূল এমন কোনো নরাধম আছে যে আপন পিতামাতাকে গালি দেয়?” তিনি বললেন, “যে অপরের পিতামাতাকে গালি দেয় এবং অপরও তার পিতামাতাকে গালি দেয়।” (বুখারি ও মুসলিম)

হাদিস থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অন্যের পিতামাতাকে গালি দেওয়া মানে নিজের পিতামাতাকে গালি দেওয়া। সমাজ গালিমুক্ত করতে গালির উত্তরে গালি দেব না, এতে গালমন্দকারী লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। গালমন্দ ভালো কাজ নয়, গালমন্দের ন্যায় অশালীন কাজ হতে আমরা বিরত থাকব।

কাজ : শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি ভাগ হয়ে গালির ক্ষতিকারক বা কুফলগুলোর একটি তালিকা তৈরি করবে।

ধূমপান ও মাদকাসক্তি

এই অপরূপ সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে আত্মাহুতি সেরা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন। তবে এর মধ্যে কিছু কিছু বস্তু মানুষের খাদ্য হিসাবে বৈধ বা হালাল করেছেন। আর যা মানুষের খাদ্য হিসাবে কল্যাণকর নয় তা অবৈধ ও হারাম করেছেন। এ প্রসঙ্গে আত্মাহুতির বাণী, “তোমরা উত্তম ও পবিত্র জিনিস খাও, তোমাদেরকে যা আমি রিযিক হিসাবে দান করেছি।” (সূরা আল বাকার-১৭২)

খাদ্য গ্রহণে আত্মাহুতি ও তার রাসুলের বিবিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও মানুষ অসংস্কৃত ও কুপ্ররোচনায় নানা ধরনের ক্ষতিকর, হারাম বা নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এতে তার নিজের, পরিবারের ও সমাজের বিরাট ক্ষতি হয়।

মাদকাসক্তি ও ধূমপান মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এগুলো নেশাজাতীয় দ্রব্য। তাই এগুলো নিষিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

অর্থ: “নেশাজাতীয় যেকোনো দ্রব্য মদ, আর যাবতীয় মদই হারাম।” (মুসলিম)

ধূমপান

মানুষের ক্ষতিকর বদঅভ্যাসগুলোর মধ্যে ধূমপান অন্যতম। ছাড়া, বিড়ি, চুহুট, সিগারেট, ধূমপানের মধ্যে পড়ে। এতে যেমন শারীরিক ক্ষতি হয় তেমনি অর্থেরও অপচয় হয়। অপব্যয়কারীকে আত্মাহুতি পছন্দ করেন না। অপব্যয়কারীকে আত্মাহুতি তা’হালা শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মহান আত্মাহুতি ঘোষণা করেছেন-

إِنَّ الْمُبْرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ

অর্থ: নিচুই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। (সূরা বনি- ইসরাইল, আয়াত ২৭)

আত্মাহুতি আরও বলেছেন, “নিচুই আত্মাহুতি তা’হালা অপব্যয়কারীকে ভালোবাসেন না।” ‘ধূম’ কোনো খাবারের মধ্যে পড়ে না। এটি স্মৃতি বা তৃষ্ণাও মেটায় না। এর দ্বারা কোনো উপকার হয় না বরং এটা মারাত্মক শারীরিক ক্ষতিসাধন করে এবং এর দ্বারা প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। এ অপব্যয় মেটাতে ধূমপায়ীরা নিজের পরিবারে অর্থের সংকট ঘটায়। আত্মীয়স্বজনের সাথে অসদাচরণ করে। এ অপব্যয়ের অর্থ সংকুলানের জন্য নানা ধরনের অবৈধ পথে পা বাড়ায়। ফলে সামাজিক অনাচার সৃষ্টি হয়। সমাজে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। ধূমপানের আর একটি ক্ষতির দিক হলো এটা খুব দারুণ গন্ধ ছড়ায়, যা অপরের জন্য ক্ষতিকর। এটা মানবাধিকারেরও পরিপন্থী।

মহানবি (স.) বলেছেন, “মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে যেন কেউ মসজিদে না যায়।”

মুখে দুর্গন্ধ থাকলে মসজিদে অন্য নামাযির কষ্ট হয়। এমনিভাবে যানবাহনে ও সভা-সমিতিতে অন্য মানুষ ধূমপায়ীদের মাধ্যমে কষ্ট পায় যা ইসলামে অবৈধ করেছে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, “ধূমপানে বিষপান।” কারণ এতে বিষ আছে। নিকোটিন জাতীয় বিষ যা ধীরে ধীরে মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে দেয়। ধূমপানের ফলে মানুষের শরীরে নানা রকমের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ব্রুকেইটিস, যক্ষ্মা, ফুসফুসের ক্যান্সার, গ্যাস্ট্রিক, ক্ষুধামন্দা, হৃদরোগ প্রভৃতি। ধূমপান পরিবেশকে নষ্ট করে। ধূমপানের সম্পর্কে যারা আসে- মহিলা, শিশু, অধূমপায়ী সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে দুটি সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন থাকে তা যদি কোনো মানুষের শরীরে ইনজেকশন দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয় তবে সে অবশ্যই মারা যাবে।

ধূমপানের ফলে ইবাদতেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ধূমপায়ীর মুখের দুর্গন্ধে মুসল্লিদের ইবাদতেও বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।

মাদকাসক্তি

সাধারণত যে সকল খাদ্যবস্তু বা পানীয় মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটায়, জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয়, সেহ ও মনে বিব্রণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, সেগুলো গ্রহণ করাকে মাদকাসক্তি বলে। মাদকাসক্তি একটি জঘন্য বদঅভ্যাস। এ সম্পর্কে

হযরত উমর (রা.) বলেছেন-

“যা জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ করে দেয় তা মাদকদ্রব্য।” (বুখারি)

মহানবি (স.) আরও ঘোষণা করেন-

“যেই বস্তুর বেশি পরিমাণের মধ্যে মাদকাসক্তির কারণ রয়েছে, তার অল্প পরিমাণও হারাম।” (তিরমিযি)

নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুগুলোর মধ্যে রয়েছে মদ, তড়ি, আফিম, গাঁজা, ভাং, চরস, হাশিশ, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, কোকেন, প্যাকেডিন, সল্জীবনী সুরা, বিভিন্ন প্রকার এ্যালকোহল ইত্যাদি। ঔষধ হিসাবে এগুলোর কিছু কিছু ব্যবহার করা হয়। তবে নেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

মহান আদ্বাহ বলেছেন: “নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজারবেদী, ভাণ্য নির্ণায়ককারী, ঘৃণ্যবস্তু শরতানের কাজ। তোমরা এসব থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।” (সূরা আল মায়িদা, আয়াত : ৯০)

মাদক দ্রব্যের কুফল মানবজীবনে মারাত্মক বিপজ্জনক। যদিও সাময়িকভাবে মাদক আনন্দ দেয় বা শক্তি দেয়। কিন্তু এর ক্ষতিকর নিক বুঝি সুদূরবিস্তৃত ও সর্বগ্রাসী। এ নেশার ফলে ব্যক্তি চুরি, ডাকাতি, খিনতাই, মারামারি, হত্যাসহ নানা প্রকার সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। এছাড়াও মাদকাসক্ত ব্যক্তি অপুষ্টি, বৃটিহীনতা, শারীরিক শীর্ণতা, লিভার ও কিডনি নষ্ট, ওজন কমে যাওয়া, শ্বাসনালির ক্ষতি প্রভৃতি সমস্যা ভোগে। কফ, কাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে দ্রুত

আক্রান্ত হয়।

মাদকাসক্ত ব্যক্তি নামায, রোযা এবং যাবতীয় ইবাদতের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। সে সব সময় অনুহু থাকে। মাদকের দেশা তাকে আত্মাহর স্বরণ থেকে দূরে রাখে, আর তাই সে পরকালে মহাশাস্তি ভোগ করবে। মহানবি (স.) বলেছেন,
“মাদকাসক্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (দারিমি)

কাজ : শিক্ষার্থীরা প্রেনিকঙ্কের বোর্ডে ধূমপানের অর্পকারিতাগুলের একটি তালিকা তৈরি করবে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মহান আত্মাহ মানুষকে অসংখ্য দান করেছেন।
২. সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে আজীব্য বলে।
৩. মিথ্যা থেকে কাজের সূচনা হয়।
৪. গিবতের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ও সৃষ্টি হয়।
৫. মুখে দুর্গন্ধ থাকলে অন্য নামাযির কষ্ট হয়।

বাম পাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে ডান পাশের সাথে মিল কর

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যে সত্য কথা বলে	সন্তানের জন্য ওয়াজিব বা কর্তব্য
২. পিতা-মাতার আদেশ নির্দেশ পালন করা	প্রতিবেশী
৩. যে ব্যক্তি কামনা করে যে তার জীবন ও আয়ু বৃদ্ধি পাক	নিন্দনীয় কাজ
৪. সামনে পেছনে ডানে বামে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত	সে যেন আজীব্যদের সাথে সুন্দর আচরণ করে
৫. গিবত একটি	তাকে সবাই ভালোবাসে ও সম্মান করে

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. আখলাক বলতে কী বুঝ ?
২. গিবত নিষ্পন্নীয় কাজ কেন ?
৩. আত্মীয়স্বজনের অধিকার বলতে কী বোঝায় ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সত্যবাদিতার একটি বাস্তব ঘটনা বর্ণনা কর।
২. পিতা-মাতার অধিকারের উপর একটি ন্যায়দীর্ঘ রচনা লেখ।
৩. ধূমপান ও মাদকাসক্তির কুফল বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'সিন্দুক' শব্দের অর্থ কী ?
 ক) সাধুতা খ) সত্যবাদিতা
 গ) মুক্তি ঘ) চরিত্র
২. 'আখলাকে ঘামিমাহ' হচ্ছে—
 i. বড়দের শ্রদ্ধা করা
 ii. কথা দিয়ে না রাখা
 iii. কারো অনুপস্থিতিতে সমালোচনা করা

কোনটি সঠিক ?

- ক) i, ii
- খ) i, iii
- গ) ii, iii
- ঘ) i, iii

৩. সকল পাপের মূল কী ?

- ক. মিথ্যা খ. ধোঁকা
 গ. প্রতারণা ঘ. গিবত

৪. আখলাক কত প্রকার ?

- ক) দুই খ) তিন
 গ) চার ঘ) পাঁচ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

নাবিল ও জামিল সহপাঠী। জামিল অন্য সহপাঠীর মাধ্যমে জানতে পারল, নাবিল তার ঘড়িটি নিয়ে গেছে। নাবিলকে বিষয়টি জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করল।

৫. নাবিলের কাজটি কীসের অন্তর্ভুক্ত?

- ক) ধায়েসের খ) মিথ্যার
গ) দিবতের ঘ) চুরির

৬. নাবিল পরকালে লাভ করবে –

- i. অন্নাত ii. আরাক iii). জাহান্নাম

কোনটি সঠিক?

- ক) i খ) ii
গ) iii ঘ) i, ii, iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। রাশেদের খালাতো ভাই মুরশেদ ও পাশের বাসার মাহমুদ ঢাকায় একই বাসায় থেকে ব্যবসা করেন। রাশেদের মা অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি হলো। অন্য লোকের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া গেলেও মুরশেদ ও মাহমুদ কোনো বৈজববর নেয় নি।

ক) 'আখলাকে হামিদাহ' অর্থ কী?

খ) প্রতিবেশীর অধিকার বলতে কী বোঝায়?

গ) মুরশেদের আচরণে কার অধিকার পালন হয় নি? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) মুরশেদের আচরণের পরিণতি ইসলামের দৃষ্টিতে আলোচনা কর।

২।



উপরোক্ত বয়স্ক পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বলেন, “বুছারীমে অধিত অসহায় বয়স্ক মানুষদের কয়েকজনের মৃত্যুর খবর তাঁর সন্তানদের জানালেও তারা মা-বাবার মুখটা পর্যন্ত দেখতে আসে নি।”

সূত্র : দৈনিক কালের কণ্ঠ, ১৩ জুন ২০১২

ক. আখলাক শব্দের অর্থ কী ?

খ. ‘সত্য মানুষকে মুক্তি দেয়’ কথাটি বুঝিয়ে লেখ।

প. উপরোক্ত বয়স্কদের প্রতি সন্তানদের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বয়স্কদের প্রতি তাদের সন্তানদের আচরণের পরিণতি ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

আদর্শ জীবন চরিত

আদর্শ জীবন বলতে বোঝায় যে জীবন অনুসরণ করলে জীবন সুন্দর ও সুগঠিত হয়। পৃথিবীতে এমন অনেক মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে যাদের জীবন চরিত অন্যের জন্য আদর্শ। সুতরাং বাস্তব জীবনে এসব মনীষীর সমাজ সেবামূলক কাজ, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মত্যাগ, ক্ষমা, পরমতসহিষ্ণুতা ও দেশপ্রেমসহ অন্যান্য গুণ অনুসরণ ও অনুকরণ করলে সুন্দর সুশৃঙ্খল ও সফল জীবন লাভ করা যায়।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- আদর্শ জীবনচরিত্রের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মহানবি (স.) এর পরিচয় সততা বিশ্বস্ততা, সমাজ সেবা, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও তার অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলি বর্ণনা করতে পারব।
- পরিচয় সহ হযরত বকর (রা.) এর দানশীলতা, ত্যাগ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তার অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- সাম্য, গণতান্ত্রিক চেতনাবোধ, দেশপ্রেম ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় হযরত উমর (রা.) এর অবদান উল্লেখ করতে পারব।
- হযরত বাদিজা (রা.) এর পরিচয় দানশীলতা, সহমর্মিতা সহ তাঁর চারিত্রিক সাধুর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- হযরত ইমাম আবু হানিফা (র.) এর পরিচয় ফিকাহ শাস্ত্রে তাঁর অবদান বর্ণনা করতে পারব।
- হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর পরিচয়, মানবপ্রেম সহ তাঁর চরিত্রের মহৎ গুণাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ ১

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শ

আরবের অবস্থা

হযরত মুহাম্মদ (স.) এর জন্মের সময় আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল ভয়াবহ ও জঘন্য। আরবের লোকেরা ছিল নানা গোপে শিশু। মারামারি, কাটাকাটি, কণ্ডা-বিবাদ, হুসি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও অরাজকতা করে তাদের জীবন চলত। তারা এক আত্মাহ্বার পরিবর্তে বিভিন্ন সেবাসেবীর পূজা করত। সমগ্র আরবদেশ বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় নিমজ্জিত ছিল। কাব্যচর্চা, গান ও বাগ্মীতায় অগ্রসর থাকলেও নৈতিক চরিত্রে আরব সমাজ পিছিয়ে পড়েছিল। হাটে-বাজারে পণ্যের মত মানুষ বেচাকেনা হত। এদের জীবন-মৃত্যু মনিবের খেলা-খুশির ওপর নির্ভর করত। মনিবেরা এদের প্রতি অমানুষিক নির্যাতন চালাত। ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে নারীদের অবস্থা ছিল খুবই করুণ। নারীদের কোনো সামাজিক মর্যাদা বা অধিকার ছিল না। এমনকি সে সময় জীবন্ত মেয়ে শিশুদের গর্তে ফেলে মাটি ঢালা দেওয়া হত। এরূপ অবস্থায় আত্মা হতাশালা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (স.) কে পাঠান। তাঁরআগেও পৃথিবীতে আরও অনেক নবি-রাসূল এসেছেন। আমাদের নবি হলেও সর্বশেষ নবি। সকল নবির সেরা নবি, বিশ্বনবি।

জন্ম ও পরিচয়

হযরত মুহাম্মদ (স.) আমাদের প্রিয় নবি। তিনি ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার মক্কার জন্মলাভ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেন। জন্মলাভের পর তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ও আহমদ।

মহানবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও পাঁচি বুহাইরার ভবিষ্যৎবাণী

আরবদের বনু সাদ গোত্রের মেয়ে ধাত্রী হালিমার ওপর শিশু মুহাম্মদের লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে। তিনি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ-মমতায় লালন-পালন করেন। এরপর মুহাম্মদ (স.) মা আমিনার কোলে ফিরে আসেন। তিনি মা আমিনার সীমাহীন আদর-যত্নে বড় হতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর কপালে এ আদরও বেশিদিন ছুটল না। তাঁর মাও মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছয় বছর। অল্প বয়সেই তিনি পিতা-মাতা উভয়কে হারিয়ে ইয়াতিম হয়ে যান। বিশ্বের বুকে তিনি তখন একা, নিঃশল ও অসহায় বালক। উম্মে আয়মান নামক একজন পরিচারিকা তাঁকে দাদা আব্দুল মুত্তলিবের হাতে তুলে দেন। দাদা অত্যন্ত আদর যত্নে তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। তাঁর বয়স যখন আট বছর তখন দাদাও তাঁকে ছেড়ে পরলোকগমন করেন। এবার তিনি চাচা আবু তালিবের হাতে বড় হতে থাকেন। চাচার সংসারে ছিল অভাব-অনটন। তিনি চাচার ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করতেন ও মেঘ চড়াতেন। চারিত্রিক সকল ভালো গুণ তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তিনি অহংকার, অপব্যয়, অর্থহীন ও অনৈতিক কথা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতেন এবং তিনি অন্যের দোষ খোঁজ ও কাউকে লজ্জা দেয়া থেকেও বিরত থাকতেন। সর্বদা মানুষের সাথে হামিশ্বশি কথা বলতেন। অন্যের ব্যাঘাত ব্যথিত হতেন। মানবতার কল্যাণে নিজের সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতেন। তিনি ছিলেন সভাবাদী। তাঁকে আপন-পর সকলেই আল-আমিন (বিধ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন। এককথায় তিনি পৃথিবীর সকল প্রাণি ও জীবজন্তুর উপকারী বস্তু ছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বয়স যখন ১২ বছর দু'মাস ১০ দিন তখন চাচা আবু তালিবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া রওয়ানা হলেন। তিনি বসরায় শৌছলে বুহাইরা (জারজিস) নামক একজন খ্রিস্টান পাদ্রির সাথে দেখা হয়। তিনি মুহাম্মদ (স.)-কে চিনতে পেরে বলেন, ইনিষ্ট শেষ জামানার নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল। পাদ্রি আবু তালিবকে বলেন, ওকে মক্কার ক্ষেত্র পাঠিয়ে দিন, ইহুদীরা তাঁর ক্ষতি করতে পারে। এ পরামর্শ অনুযায়ী চাচা আবু তালিব কয়েকজন ভৃত্যের সঙ্গে প্রিয় ভাতিজাকে মক্কার পাঠিয়ে দেন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবি (স.)

ওকাজ মেলায় জুয়া খেলাকে কেন্দ্র করে ফিজার যুদ্ধ শুরু হয়। তা একটানা পাঁচ বছর চলতে থাকে। এতে অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে। মহানবি (স.) এসব হানাহানি ও রক্তারক্তি অবস্থা দেখে ব্যথিত হলেন। কীভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। অবশেষে তিনি শান্তিকামী কয়েকজন যুবককে নিয়ে 'হিলফুল যুফুদ' নামে একটি শান্তিসংঘ গঠন করেন। এর মাধ্যমে তিনি তৎকালীন আরবের চলমান হিংসা-বিষে, মারামারি ও হানাহানি বন্ধ করতে আশ্রণ চেষ্টা করেন। তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে সমাজে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও গোড়ে গোড়ে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয় এবং তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আপন-পর সকলেই তাঁকে আল-আমিন (বিধ্বাসী) উপাধিতে ভূষিত করেন।

কুহাইশগণ বহুদিনের পুরাতন কাবা ঘর সংস্কারের কাজ হাতে নিল। কাবা ঘর সংস্কারের কাজ সমাপ্ত হলো। কিন্তু পবিত্র হাজের আসওয়াদ (কাণো পাথর) স্থাপন করা নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হলো। এ ঝগড়া বিভিন্ন গোড়ে ছড়িয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই এ পাথর স্থাপনের মত মহৎ কাজের অংশীদার হতে চাইল। কেউ ছাড় দিতে রাজি হলো না। তাই প্রত্যেকের মধ্যে যুদ্ধের প্রবৃত্তি শুরু হলো। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো আগামী দিন সকাল বেলা সবার আগে যিনি কাবা ঘরে প্রবেশ করবেন তিনিই এ বিবাদ সীমাহীন করবেন। তিনি যা সিদ্ধান্ত দেবেন সকলেই তা মেনে নেবে। সকাল বেলা দেখা গেল হযরত মুহাম্মদ (স.) সবার আগে কাবা ঘরে প্রবেশ করেছেন। এটা দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করল এবং বলে উঠল, "আল-আমিন" এসেছেন, সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। হযরত মুহাম্মদ (স.) একখানা চামর